উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি

২০১৪-২০১৫

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি

২০১৪-২০১৫

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল

ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন

ড. ভাগ্য রানী বণিক

মো. শোয়েব হাসান

ড. মো. লুৎফর রহমান

মো. হাসান হাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর

প্রকাশ কাল
অক্টোবর ২০১৫
২০০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
দি ঢাকা প্রিন্টার্স
৬৭/ডি, গ্রীন রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৮২২৮২৮৮৬৯

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিবছর গবেষণাধীন ফসলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নত জাত, উৎপাদন পদ্ধতি, মৃত্তিকা ও সেচ ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, উন্নত ফসল বিন্যাস, কৃষি যন্ত্রপাতিসহ নানা রকমের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকে যা সচিত্র সন্নিবেশ করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশের মূল লক্ষ্য হলো যাদের জন্য এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে তাদের নিকট তা যথাসময় পৌঁছে দেয়া। এছাড়া, এসব মূল্যবান তথ্য সংকলন করে সংরক্ষণ করাও প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ইনস্টিটিউট হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গমের ২টি (বারি গম-২৯, বারি গম-৩০), বার্লির ১টি (বারি বার্লি-৭), আলুর ৮টি (বারি আলু-৫৪, বারি আলু-৫৫, বারি আলু-৫৬, বারি আলু-৫৭, বারি আলু-৫৮, বারি আলু-৫৯, বারি আলু-৬০, বারি আলু-৬১), সরিষার ১টি (বারি সরিষা-১৭), মসুরের ১টি (বারি মসুর-৮), মুগের ২টি (বারি মুগ-৭, বারি মুগ-৮), আমের ১টি (বারি আম-১১), কাঁঠালের ২টি (বারি কাঁঠাল-২, বারি কাঁঠাল-৩), কুলের ১টি (বারি কুল-৪), কদবেলের ১টি (বারি কদবেল-১), জলপাইয়ের ১টি (বারি জলপাই-১), স্ট্রবেরির ২টি (বারি স্ট্রবেরি-২, বারি স্ট্রবেরি-৩), ড্রাগনের ১টি (বারি ড্রাগন ফল -১), টমেটোর ২টি (বারি টমেটো-১৬, বারি টমেটো-১৭), হাইব্রিড টমেটোর ১টি (বারি হাইব্রিড টমেটো-৯), ঝিঙ্গার ১টি (বারি ঝিঙ্গা-২), ব্রোকলির ১টি (বারি ব্রোকলি-১), কামরাঙ্গা শিমের ১টি (বারি কামরাঙ্গা শিম-১), শিমের ১টি (বারি শিম-৮), পালংশাকের ১টি (বারি পালংশাক-১), চিনালের ১টি (বারি চিনাল-১), হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়ার ১টি (বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-১), মিষ্টি মরিচের ১টি (বারি মিষ্টি মরিচ-২), হাইব্রিড পটলের ১টি (বারি হাইব্রিড পটল-১) এবং ঢেঁড়সের ১টি (বারি ঢেঁড়স-২) করে মোট ৩৭টি উন্নত উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এছাড়া, উন্নত ফসল বিন্যাস, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ২১ (একুশ) টি লাগসই প্রযুক্তি এই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে।

আমি আশা করি, পুস্তিকাটি প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমে ম্যানুয়াল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রযুক্তিসমূহ প্রয়োগ করে আমাদের দেশের কৃষকেরা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ছাত্র-শিক্ষক, সম্প্রসারণবিদ ও কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মীরা পুস্তিকাটি দ্বারা উপকৃত হবেন। পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হোক এই কামনা করছি। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। পুস্তিকাটির সংকলন ও সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

(ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল)

বিষয় সূচি

গমের জাত

বারি গম-২৯ ০৭
বারি গম-৩০ ০৮

বার্লির জাত

বারি বার্লি-৭ ১১

আলুর জাত

বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা) ১৩
বারি আলু-৫৫ (রেড ফ্যান্টাসী) ১৩
বারি আলু-৫৬ ১৪
বারি আলু-৫৭ ১৫
বারি আলু-৫৮ (এলমান্ডো) ১৫
বারি আলু-৫৯ (মেট্রো) ১৬
বারি আলু-৬০ (ভিভালডি) ১৬
বারি আলু-৬১ (ভলুমিয়া) ১৭

সরিষার জাত

বারি সরিষা-১৭ ১৯

ডালের জাত

বারি মসুর-৮ ২৩
বারি মুগ-৭ ২৫
বারি মুগ-৮ ২৬

ফলের জাত

বারি আম-১১ ২৯
বারি কাঁঠাল-২ ৩২
বারি কাঁঠাল-৩ ৩৩
বারি কুল-৪ ৩৬
বারি কদবেল-১ ৩৯
বারি জলপাই-১ ৪১
বারি স্ট্রবেরি-২ ৪৩
বারি স্ট্রবেরি-৩ ৪৪
বারি ড্রাগন ফল-১ ৪৭

সবজির জাত

বারি টমেটো-১৬ ৫০
বারি টমেটো-১৭ ৫১

বারি হাইব্রিড টমেটো-৯ ৫৩
বারি ঝিঙ্গা-২ ৫৬
বারি ব্রোকলি-১ ৫৮
বারি কামরাঙ্গা শিম-১ ৬০
বারি শিম-৮ ৬১
বারি পালংশাক-১ ৬৩
বারি চিনাল-১ ৬৪
বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-১ ৬৫
বারি মিষ্টি মরিচ-২ ৬৭
বারি হাইব্রিড পটল-১ ৭২
বারি ঢেঁড়স-২ ৭৫

অন্যান্য প্রযুক্তি

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি উৎপাদন ৭৭
সূর্যমুখী উৎপাদনে ঘাটতি সেচ প্রয়োগ প্রযুক্তি ৭৯
লবণাক্ত অঞ্চলে রবি ফসলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহার ৮১
অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে টমেটো ফসল উৎপাদন ৮৩
হাইব্রিড ভুট্টা মানের বীজ উৎপাদনের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা ৮৫
স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে রসুন উৎপাদন ৮৭
বারি আলু রোপণ যন্ত্র ৯০
বারি উন্নত বেড প্লান্টার ৯১
বারি বহুফসলী বীজ বপন যন্ত্র ৯৩
হরমোন প্রয়োগে বেগুন চাষ ৯৪
ঝাড় শিমের সার ব্যবস্থাপনা ৯৭
বরবটির ফল ছিদ্রকারী পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ৯৯
ঢেঁড়শের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ১০০
সরিষা-বোরো-পাট-রোপা আমন ফসল বিন্যাস ১০১
আলু + ভুট্টা-পাট-রোপা আমন ফসল বিন্যাস ১০২
আলু/ভুট্টা (সাথী ফসল)-রোপা আমন ফসল বিন্যাস ১০৪
সাথী ফসল হিসেবে রোপা আমন ধানের সাথে মসুর ও সরিষার মিশ্র চাষ ১০৫
আলু-পাট-রোপা আমন ফসল বিন্যাসে আলুর সার সুপারিশমালা ১০৬
বিনা চাষে খড়ের মালচ্ ব্যবহার করে রসুন উৎপাদন ১০৭
লাউ এর সাথে ধনিয়ার আন্তঃফসল চাষ ১০৮
আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়ার চাষ ১০৯
কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার ১১০

গমের জাত

বারি গম-২৯

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম-২৯ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত সৌরভ জাতের সঙ্গে সিমিটের একটি জাতের সংকরায়ণের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিএডাব্লিউ ১১৫১ নামে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারি ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় ভাল ফলন দেয়ায় জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ সালে বারি গম-২৯ নামে অবমুক্ত করা হয়। জাতটি আকারে খাট এবং এর কাণ্ড শক্ত হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি তাপ সহনশীল, দানা সাদা ও আকারে মাঝারী।

জাতটির উচ্চতা ৯২-৯৬ সেন্টিমিটার এবং কুশির সংখ্যা তিন থেকে পাঁচটি। শীষ বের হতে ৬০-৬৪ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী হওয়ায় ভবিষ্যতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হলে তা মোকাবেলায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। জাতটি শতাব্দীর চেয়ে গড়ে প্রায় ১০-১৫ ভাগ বেশি ফলন দেয়। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০০০-৫০০০ কেজি।

চারা অবস্থায় কুশিগুলো খাড়া (Erect) থাকে। গাছের রঙ গাঢ় সবুজ। উপরের কাণ্ডের গিঁড়ায় মাঝারী সংখ্যক রোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে যা নিশান পাতার খোলে ও কাণ্ডে খুব ঘনভাবে থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা (Indented), ঠোঁট মাঝারী (৫.১-১২.০ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে।

বারি গম-৩০

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩০ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি গম ৩০ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে বিএডাব্লিউ ৬৭৭ এবং বিজয় (বারি গম ২৩) জাতের সাথে সংকরায়ণের মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিএডাব্লিউ ১১৬১ নামে এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারি ও ফলন পরীক্ষায় এ কৌলিক সারিটি ভালো বলে প্রমাণিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি স্বল্প মেয়াদী এবং তাপ সহনশীল। দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য জাতটি খুবই উপযোগী।

চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ । শীষ বের হতে ৫৭-৬২ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০০-১০৫ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪৫০০-৫৫০০ কেজি এবং জাতটি শতাব্দীর চেয়ে গড়ে প্রায় ১৫-২০ ভাগ বেশি ফলন দেয়।

চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো (Semi-Erect) থাকে। গাছের রঙ গাঢ় সবুজ। উপরের কাণ্ডের গিঁড়ায় মাঝারী কোন রোম (Hair) থাকে না। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। মোমের মত আবরণ শীষে ও কাণ্ডে হালকা এবং নিশান পাতার খোলে মাঝারী আকারে থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা (Indented), ঠোঁট মাঝারী (৫.১-১২.০ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপনের সময়: নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) গম বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি মধ্যম মাত্রার তাপসহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসে ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি ফলন দেয়।

বীজের পরিমাণ: গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টরপ্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

বীজ শোধন: প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাক নাশক (প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে বীজ বাহিত রোগ দমন হয় এবং বীজ গজানোর ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ চারা সবল ও সতেজ হয়। বীজ শোধন করলে ফলন শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

বপন পদ্ধতি: সারিতে অথবা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরির পর ছোট লাঙ্গল বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে ২০ সে. মি. বা ৮ ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতে এবং ৪-৫ সে. মি. গভীরে বীজ বুনতে হবে। ধান কাটার পর পরেই পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্পতম সময়ে গম বোনা যায়। এ যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে জমি চাষ, সারিতে বীজ বপন ও মইয়ের কাজ করা যাবে।

সার প্রয়োগ: জমি চাষের শুরুতে হেক্টরপ্রতি ৭.৫-১০ টন গোবর/কম্পোস্ট জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। জৈব সার প্রয়োগ করার পর সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ১৫০-১৭৫ কেজি ইউরিয়া, ১৩৫-১৫০ কেজি টিএসপি, ১০০-১১০ কেজি পটাশ ও ১১০-১২৫ কেজি জিপসাম সার শেষ চাষের পূর্বে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে চারার তিন পাতা বয়সে প্রথম সেচের পর দুপুর বেলা মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৭৫-৯০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সমস্ত ইউরিয়া শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। তবে সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির পর জমি ভেজা থাকা অবস্থায় উপরি প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত ইউরিয়া প্রয়োগ করা ভাল। জমিতে প্রায়শ বোরন সারের ঘাটতি দেখা যায় বলে প্রতি হেক্টরে ৬.৫ কেজি হারে বরিক এসিড শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। যেসব জমিতে দস্তা সারের ঘাটতি রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ফসলে দস্তা প্রয়োগ করা হয়নি সে সব জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টরপ্রতি ১২.৫ কেজি দস্তা সার যথা জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট শতকরা ৩৬ ভাগ জিংক সম্বলিত) শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করা ভালো।

জমিতে অম্লীয় মাত্রা ৫.৫ এর নিচে হলে হেক্টরপ্রতি ১০০০ কেজি হারে ডলোচুন গম বপনের কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ৩ বছরে একবার ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: মাটির প্রকার ভেদে গম আবাদে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর) দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে। তবে মাটির প্রকারভেদে ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ভাল ফলনের জন্য অতিরিক্ত এক বা একাধিক সেচ দেয়া ভাল। প্রথম সেচটি খুবই হালকাভাবে দিতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত পানিতে চারার পাতা হলুদ এবং চারা সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেচের পর পরই জমি থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে। তাই বপনের পর জমির ঢাল বুঝে ২০-২৫ ফুট অন্তর নালা কেটে রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা: বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে বীজ বা চারার সংখ্যা সঠিক থাকে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। নিড়ানীর ফলে মাটি আলগা হবে এবং আর্দ্রতা বজায় থাকবে। চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা (বথুয়া ও কাকরি) দমনের জন্য ২,৪ ডি এমাইন বা এফিনিটি জাতীয় আগাছা দমনকারী ঔষধ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩৫ মিলিলিটার হিসেবে ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে মেঘমুক্ত দিনে একবার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সময়মত আগাছা দমন করলে ফলন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড বা ল্যানিরেট) দিয়ে দমন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: গম গাছ সম্পূর্ণরূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে কাটার উপযুক্ত সময় হিসেবে গণ্য হবে। গম পাকার পর বেশি দিন ক্ষেতে থাকলে ঝড়/শিলা বৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে গম কেটে দুপুরে মাড়াই করা উত্তম। মড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সহজে গম মাড়াই করা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য শীষ বের হওয়ার পর হতে পাকা পর্যন্ত কয়েকবার অন্য জাতের মিশ্রণ, রোগাক্রান্ত গাছ এবং আগাছা গোড়াসহ উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ সংগ্রহের জন্য গম পাকার পর হলুদ হওয়া মাত্রই কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে আলাদা করে মাড়াই করতে হবে এবং মাড়াইয়ের পর কয়েক দিন বীজ শুকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ বা তার নিচে রাখতে হবে। দানা দাঁতের নিচে চাপ দিলে কট করে শব্দ হলে বুঝতে হবে যে, উক্ত বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। সংরক্ষণের পূর্বে পুষ্ট বীজ চালনি দিয়ে চেলে বাছাই করে নিতে হবে।

বার্লির জাত

বারি বার্লি-৭

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি বার্লি-৭ একটি লবণাক্ততা সহনশীল খোসামুক্ত বার্লির জাত। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সংগৃহীত কারান-৩৫১ এর সাথে ইকারডার E-21জাতের সংকরায়ণের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। দেশের বিভিন্ন লবণাক্ত এলাকায় মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় ভাল ফলন দেয়ায় জাতটা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ সালে বারি বার্লি-৭ নামে অবমুক্ত করা হয়।

লবণাক্ত এলাকায় এ জাতের গাছের গড় উচ্চতা ৫০-৬৫ সে.মি.। শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ৯০-১০৫ দিন সময় লাগে। জাতটির শীষ ছয় সারি বিশিষ্ট ও দানাগুলো খোসা মুক্ত। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৩৮-৪৮। দানার রঙ বাদামী ও আকারে মাঝারী। হাজার দানার ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। জাতটি ০৮ ডিএস/মি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। হেক্টরপ্রতি ফলন ২.২০-২.৫০ টন/হেক্টর (লবণাক্ত এলাকায়)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: পানি জমে না এমন বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি বার্লি চাষের জন্য উপযুক্ত। জমিতে 'জো' আসার পর মাটির প্রকার ভেদে ৩-৪টি আড়া আড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

বপনের সময়: মধ্য কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ মাস (নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর) পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। এর চেয়ে দেরি হলে ফলন কমে যায়।

বীজের হার: বার্লি ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টরপ্রতি ১২০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ১০০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। সারিতে বুনলে ২ সারির মাঝে দূরত্ব ২০-২৫ সে.মি. রাখতে হবে। লাঙ্গল দিয়ে ৩.৫ সে.মি. গভীর নালা টেনে তাতে বীজ বুনে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

বীজ শোধন: প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাক নাশক (প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে বীজ বাহিত রোগ দমন হয়।

সার প্রয়োগ: সাধারণত অনুর্বর জমিতে বার্লি চাষ করা হলেও সুপারিশমত সার প্রয়োগে এর ফলন বাড়ানো যায়। প্রতি হেক্টর সেচযুক্ত জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি ও পটাশ সার যথাক্রমে ১৮০ কেজি, ১২৫ কেজি, ১০০ কেজি এবং সেচ বিহীন জমিতে ১৩৫ কেজি, ১২৫ কেজি, ১০০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ বিহীন চাষে সমস্ত সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করা উত্তম। জমিতে সেচের সুবিধা থাকলে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে বর্ণিত ইউরিয়ার অর্ধেক ভাগ ও অন্যান্য সারের সবটুকু মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ২ কিস্তিতে বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (সেচের পর) প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে ১-২টি হালকা সেচের ব্যবস্থা করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথম সেচ দিতে হবে কুশি ছাড়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর)।

অন্যান্য পরিচর্যা: বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে মাঠে চারার সংখ্যা ঠিক থাকে। চারা গজানোর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ৮-১০ সে.মি. দূরত্বে একটি চারা রেখে বাকি চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে। জমিতে আগাছা দেখা দিলে নিড়ানী দিয়ে দমন করতে হবে। ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড বা ল্যানিরেট) দিয়ে দমন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: বার্লির শীষ খড়ের রঙ ধারণ করলে ও পাতা কিছুটা বাদামী রঙ ধারণ করলে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে বার্লি সংগ্রহ উত্তম।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য শীষ বের হওয়ার পর হতে পাকা পর্যন্ত কয়েকবার অন্য জাতের মিশ্রণ, রোগাক্রান্ত গাছ এবং আগাছা গোড়াসহ উঠিয়ে ফেলতে হবে। দানা দাঁতের নিচে চাপ দিলে 'কট' করে শব্দ হলে বুঝতে হবে বীজ সংরক্ষণের উপযুক্ত হয়েছে। গাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করার পর রোদে ৩-৪ দিন খুব ভালভাবে শুকিয়ে মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে দানা ছাড়িয়ে নিতে হবে। দানা ছাড়িয়ে ভালভাবে ঝেড়ে আবার রোদে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের ভিতর আনতে হবে। শুকনো বীজ মাটির বা টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। পাত্রের মুখ বন্ধ রাখতে হবে যাতে বাইরের বাতাস পাত্রে ঢুকতে না পারে।

আলুর জাত

বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত মিউজিকা (বংশ CMK 1993-042-005 X Lady Christl) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৪' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। ৩-৬টি কাণ্ড থাকে। পাতা ছোট আকারের, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম বা থাকে না। আলু মাঝারী আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। শুষ্ক পদার্থ ১৮.১৮ ± ১%। অঙ্কুর ছোট আকারের ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক মাঝারী লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪১.১৯ (২৫.৫৯-৫৭.৫১) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৫ (রেড ফ্যান্টাসী)

জার্মানী থেকে সংগৃহীত রেড ফ্যান্টাসী (বংশ Laura x Miriam) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৫' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী। ৩-৬টি কাণ্ড থাকে। পাতা মাঝারী

আকারের, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি গাঢ়। আলু মাঝারী থেকে বড় আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রঙ লাল, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। শুষ্ক পদার্থ ১৭.২৩ ± ১%। অঙ্কুর ছোট আকারের স্কেরিক্যাল, গোড়ার দিক লোমযুক্ত, অগ্রভাগ লোম বিহীন এবং এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৩ টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৬

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত (বংশ G90) জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৬' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। কাজলাল-বাদামী এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা মধ্যম আকৃতির, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ লাল (বেগুনী), চামড়া মসৃণ, শাসের রঙ হলুদ। গভীর চোখ বিশিষ্ট। শুষ্ক পদার্থ ১৯.১৫ ± ১%। অঙ্কুর মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবন কাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৬.৬৭ (২৯.৬৪-৪৫.০১) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী ও স্কেব রোগ প্রতিরোধী।

বারি আলু-৫৭

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত (বংশ C90) জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৭' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা মধ্যম আকৃতির, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হলুদ, চামড়া মসৃণ, আলুর শাসের রঙ সাদা। চোখ মধ্যম গভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৯৭ ± ১%। অঙ্কুর মাঝারী ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী । সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবন কাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৭.৭৪ (২৯.৩৪-৪৫.২৪) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি নাবি ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৮ (এলমান্ডো)

হল্যান্ড থেকে সংগৃহীত এলমান্ডো (বংশ HE0950251-84× VALOR) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৮' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি। ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। পাতা বড় আকার, মাঝারী ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। আলু ডিম্বাকৃতি

থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ, রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ ক্রীম এবং চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৬.৫ ± ১%। অঙ্কুর মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক বেশি পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী । অঙ্কুরোদগম সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৪.৬১ (৪২.৪৬-৪৬.৬৩) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৯ (মেট্রো)

হল্যান্ড থেকে সংগৃহীত মেট্রো (বংশ Mondial × Felsina) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৯' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম । কাণ্ড ৫-৭টি থাকে। পাতা মধ্যম আকার, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই। আলু ডিম্বাকৃতি মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাসের রঙ ক্রীম এবং চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৩৩ ± ১%। মাঝারী কনিক্যাল, গোড়ার দিক বেশি পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী । সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৩.৫৩ (৩৯.২৪-৪৮.৮৮) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ এ জাতটি খাবার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

বারি আলু-৬০ (ভিভালডি)

হল্যান্ড থেকে সংগৃহীত ভিভালডি (বংশ T.S 77-148 x MONALISA) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৬০' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ এবং গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। কাণ্ড ৫-৬টি থাকে। পাতা মধ্যম আকার, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই। আলু লম্বাটে থেকে বেশি লম্বাটে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ ক্রীম এবং চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৭.৫৮ ± ১%। অঙ্কুর মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক খুব কম পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী । সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪২.০৫ (৩৫.৭৯-৪৮.২৯) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬১ (ভলুমিয়া)

হল্যান্ড থেকে সংগৃহীত ভলুমিয়া (বংশ MONDIAL x ADORA) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৬১' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ এবং গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। কাণ্ড ৪-৫টি থাকে। পাতা মধ্যম আকার, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই। আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির এবং বেশি লম্বাটে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ এবং চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৭.৪৩ ± ১%। অঙ্কুর মাঝারী কনিক্যাল, গোড়ার দিক বেশি পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে

অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৯.৯৬ (৩৬.৪৪-৪৩.৫৭) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি খাবার উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: আলু চাষের জন্য বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ ধরনের মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

বপনের সময়: উত্তরাঞ্চলে মধ্যে- কার্তিক (নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ), দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রহায়ণ ১ম সপ্তাহ থেকে ২য় সপ্তাহ (নভেম্বর মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ)।

বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ১.০ - ১.৫ টন। রোপণের দূরত্ব ৬০ x ২৫ সে.মি. (আস্ত আলু) এবং ৪৫ x ১৫ সে.মি. (কাটা আলু)।

সারের পরিমাণ: আলু চাষে নিচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন (জমির উর্বরতা ভেদে সারের পরিমাণ কমবেশি হতে পারে)।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২৫০-৩৫০ কেজি
টিএসপি	১২০-১৫০ কেজি
এমপি	২৫০-৩৫০ কেজি
জিপসাম	১০০-১২০ কেজি
জিংক সালফেট	৮-১০ কেজি
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (অম্লীয় বেলে মাটির জন্য)	৮০-১০০ কেজি
বরিক এসিড (বেলে মাটির জন্য)	৮-১০ কেজি
গোবর	৮-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর, অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট (প্রয়োজনবোধে) রোপণের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয় বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে। অম্লীয় বেলে মাটির জন্য হেক্টরপ্রতি ৮০-১০০ কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং বেলে মাটির জন্য বরিক এসিড হেক্টরপ্রতি ৮-১০ কেজি প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

পানি সেচ: বীজ আলু বপনের ০৪-০৫ দিনের মধ্যে মাটির আর্দ্রতা বুঝে প্রথম সেচ দিতে হবে এতে গাছ ভালভাবে গজাতে পারে, বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (স্টোলন হওয়ার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে, তৃতীয় সেচ বীজ আলু বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে (গুঁটি বের হওয়া পর্যন্ত) এবং চতুর্থ সেচ আলু বীজ বপনের ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে (গুঁটির বৃদ্ধি পায়) দিতে হবে । দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি ফলন পেতে হলে ৮-১০ দিন পর সেচ দিতে হবে। বপনের ৬৫-৭০ দিনের পর সেচ না দেওয়া উত্তম।

সরিষার জাত

বারি সরিষা-১৭

বাংলাদেশে সাধারণত ব্রাসিকা রাপা (পূর্বের নাম ব্রাসিকা ক্যামপেসট্রিস) এবং ব্রাসিকা জানসিয়া এই দুই প্রজাতির সরিষার চাষ হয়ে থাকে। তন্মধ্যে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ব্রাসিকা রাপা প্রজাতির সরিষার চাষ হয়। বারি সরিষা-১৭ জাতটি ব্রাসিকা রাপা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। বারি সরিষা-১৫ ও সোনালী সরিষা (এসএস-৭৫) এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভবিত বিসি-১০১৫৭৫ (১৭)-১ লাইনটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর এর গবেষণা মাঠে পর্যায়ক্রমে মূল্যায়নের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী হিসেবে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে লাইনটি প্রাথমিক ও আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় প্রচলিত জাত বারি সরিষা-১৪ , বারি সরিষা-১৫ ও টরি-৭ এর তুলনায় সর্বোচ্চ ফলন দিয়ে থাকে। উক্ত লাইনটি ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি) এর প্রকল্প এলাকায় (রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলায়) কৃষকের মাঠে মূল্যায়নে প্রচলিত জাতের তুলনায় ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে। এ ছাড়াও সরেজমিন গবেষণা পরীক্ষার মাধ্যমে কৃষকের মাঠে উক্ত লাইটি প্রচলিত জাতের পাশাপাশি তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয় এবং লাইনটির উৎকৃষ্টতা প্রমাণিত হয়। বিসি-১০১৫৭৫ (১৭)-১ লাইনটি ২০১৪ সালে নভেম্বরে বারি সরিষা -১৭ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

বারি সরিষা-১৭ এর বৈশিষ্ট্য

উচ্চতা : ৯৫-১০০ সে.মি.

পাতা : হালকা সবুজ রঙের এবং মসৃণ। কচি পাতার বোঁটা কাণ্ডকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখে।

শাখা : প্রাথমিক শাখার সংখ্যা সাধারণত ৬-১০টি। সেকেন্ডারী শাখা হয়না বললেই চলে।

ফুল : প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির উপরে থাকে। ফুলের রঙ হলুদ।

শুঁটি : প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৮৫-১০৫টি। প্রত্যেক শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ২৮- ৩০টি।

বীজ : বীজের রঙ হলুদ বর্ণের। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৫-৪.০০ গ্রাম

স্থিতিকাল : ৮০-৮৫ দিন

বপন কাল : অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝী।

ফলন : প্রতি হেক্টরে ১৭০০-১৮০০ কেজি। এ জাতটি বারি সরিষা-১৪ এর চেয়ে ৫-১০ ভাগ বেশি ফলন দেয়।

শস্যবিন্যাস : আমন ধান কাটার পর স্বল্পমেয়াদী জাত হিসেবে চাষ করে বোরো ধান রোপণ করা সম্ভব।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া: সরিষা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে এবং ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে ভালভাবে জন্মায়। তবে, গাছের বৃদ্ধির জন্য ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তম।

মাটি ও জমি তৈরি: এ জাতের সরিষা দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। মাঝারী উঁচু জমি এ জাতের চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। বীজ ছোট বিধায় জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হয়। পর পর ৪-৬টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়। জমিতে যাতে বড় ঢিলা ও আগাছা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ: বারি সরিষা-১৭ এর ভাল ফলন পেতে হলে নিম্নলিখিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সারের মাত্রা কৃষি পরিবেশ অঞ্চল এবং জমির উর্বরতা ভেদে কম বেশি হতে পারে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	হেক্টরপ্রতি (কেজি)	একরপ্রতি (কেজি)	বিঘাপ্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	২০০-২৫০	৮০-১০০	২৬-৩৫
টিএসপি	১৫০-১৭০	৬০-৭০	২০-২৪
এমপি	৭০-৮৫	৩০-৩৫	১০-১২
জিপসাম	১২০-১৫০	৫০-৬০	১৭-২০
জিংক অক্সাইড	০-৫	০-২	০.০-০.৬৭
বরিক এসিড	০-৫	০-৩	১.২৫-১.৫০

নাইট্রোজেন সার সরিষার ফলন বৃদ্ধির জন্য দরকার। তবে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে গাছ হেলে পড়ে, পরিপক্কতার সময় বিলম্বিত হয় এবং তেলের পরিমাণ কমে যায়।

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ফসফরাস সার দরকার, যেহেতু সরিষার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে সেজন্য বীজ বপনের পূর্বে ফসফরাস সার প্রয়োগ করতে হয় যাতে মাটির গভীরে অবস্থিত শিকড় ভালভাবে ফসফরাস সার গ্রহণ করতে পারে। তবে অতিরিক্ত প্রয়োগে এ সার সরিষার তেলের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেয়। সরিষার বেশি ফলনের জন্য সালফার ও বোরন সারের ব্যবহার অপরিহার্য। জাতটির বীজের রঙ হলুদ বিধায় শতকরা ৩-৪ ভাগ তেল বেশি নিষ্কাশন করা যায়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সরিষা ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত তাড়াতাড়ি শারীরিক বৃদ্ধির জন্য বেশির ভাগ সার গ্রহণ করে থাকে। সেজন্য অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সবটুকু শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসেবে চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে রস থাকা বাঞ্ছনীয়। রস কম থাকলে হালকা সেচ দেওয়ার পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বপনের সময়: সরিষার বপন সময় শীত শুরুর সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণত আশ্বিন মাসের শেষ থেকে কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর) এ জাত বপন করার উপযুক্ত সময়। দেরিতে বপন করলে ফলন কমে যায়। দেশের উত্তর অঞ্চলে যেহেতু শীত আগে আসে সেখানে আগাম বপন করা সম্ভব। আমন ধান কাটার পর বেশি দেরি না করে সরিষা বপন করা উচিত।

বীজের হার: হেক্টর প্রতি(কেজি), একর প্রতি(কেজি), বিঘা প্রতি(কেজি) যথাক্রমে ৬.০০-৭.০০, ২.১-২.৪০, ০.৭০ - ০.৮০

বপন পদ্ধতি: সারিতে এবং ছিটিয়ে উভয় প্রকারেই সরিষার বীজ বপন করা যায়। সারিতে বুনলে এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. এবং সারিতে বীজ লাগাতার বপন করতে হয়। সারিতে বুনলে পরবর্তীতে আগাছা দমন ও অর্ন্তবর্তী পরিচর্যা করা সহজ হয়। সারি তৈরির জন্য লোহার তৈরি টাইন অথবা ছোট কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করা যেতে পারে। আড়াই থেকে তিন সে.মি. গভীরে বীজ বপন করার পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে শেষ চাষের পর বীজ বপন করতে হবে এবং মই দিয়ে সমান করে দিতে হবে। সরিষার বীজ ছোট

বিধায় বপনের সুবিধার জন্য বীজের সঙ্গে ঝুরঝুরে মাটি অথবা ছাই মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সেচ প্রয়োগ: সরিষার ফলন বৃদ্ধির জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকা প্রয়োজন। সাধারণত মাটিতে যে রস থাকে তার মাধ্যমে আমাদের দেশে সরিষার চাষাবাদ করা হয়। বর্তমানে যেখানে সেচের সুযোগ রয়েছে সেখানে উন্নত জাতের সরিষা সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়। সেচ অধিক দিন গাছে পাতা ধরে রাখতে সাহায্য করে তাতে সরিষার ফলন অধিক হয়। জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ প্রয়োগ করতে হয়। কখনো কখনো বপনের সময় জমিতে রসের অভাব থাকে, সেক্ষেত্রে বপনের আগেই সেচ দিয়ে রসের ব্যবস্থা করতে হবে। ফুল আসার আগে অর্থাৎ বপন করার ১৮-২০ দিন পর এবং শুঁটি হওয়ার সময় ৫০-৫৫ দিনে জমিতে রস থাকা প্রয়োজন। কাজেই এ সময়ে জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সরিষার জমিতে সাধারণত প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেচের পানি জমিতে আটকে না থাকে। ফোয়ারা পদ্ধতিতে সরিষার জমিতে সেচ দেওয়া উত্তম।

পরিচর্যা: চারা গজানোর ১০-১২ দিনের মধ্যে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিনে দ্বিতীয় বার নিড়ানী দিয়ে অতিরিক্ত চারা এবং আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গ মিটার জমিতে ৫০-৬০টি সরিষার গাছ থাকা বাঞ্ছনীয়। সেচ দেওয়ার পর জমিতে 'জো' আসার সথে সাথে কোদাল অথবা নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে দিলে জমিতে বেশি দিন পানি ধরে রাখা যায়। বাড়ন্ত অবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পোকামাকড় ও রোগবালাই ফসলের ক্ষতি না করে।

ফসল কর্তন, বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ: পরিপক্কতার সময় অনুকূল আবহাওয়ায় সরিষা আগাম বপন করলে পরিপক্কতা দেরি হয় কিন্তু দেরিতে বপন করলে অল্প সময়ে পরিপক্কতা আসে। আগাম বপন করলে সরিষা গাছের বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দেরিতে বপন করলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির চেয়ে কম হয়ে থাকে। বারি সরিষা-১৭ পরিপক্কতার সময় ৮২-৮৬ দিন। সরিষার ফলন এবং বীজের গুণগত মান বপনের সময় এবং কর্তন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। যখন গাছের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ শুঁটি খড়ের রঙ ধারণ করে তখন সরিষা কাটার উপযুক্ত সময়। সকালে শুঁটিসহ গাছ কেটে বা উপড়িয়ে মাড়াই করার স্থানে নিতে হবে এবং গাদা দিয়ে কয়েকদিন রাখতে হবে। পরে দুদিন রোদ্রে গাছ শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়াই করতে হবে। এ সময় বীজের মধ্যে পানির পরিমাণ ২০% অধিক থাকা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে,

গুটি যাতে মাঠে অতিরিক্ত পেকে না যায়। বেশি পেকে গেলে, বীজ ক্ষেতে ঝরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়েও সরিষা মাড়াই করা যায়। বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে রোদে ভালভাবে তিন-চার দিন শুকিয়ে নেবার পর শুষ্ক পাত্রে সংরক্ষণ করা উত্তম। সরিষার শুকনো বীজ অর্থাৎ ৮-১০% আর্দ্রতাসহ যে কোন পরিষ্কার শুকনো পাত্রে ঘরের শীতল স্থানে রাখলে বেশি সময় অর্থাৎ ২-৩ বছর বীজ সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত বীজ মাঝে মধ্যে শুকিয়ে আবার সংরক্ষণ করতে হয়।

ডালের জাত

বারি মসুর-৮

২০০৭ সালে ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনায় ICARDA, সিরিয়া, থেকে উচ্চ মাত্রায় জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ কিছু জার্মপ্লাজম আসে। ঐ জার্মপ্লাজমগুলো পরপর দুই বছর ডাল গবেষণা কেন্দ্র, পাবনাতে মূল্যায়ন করা হয়। এদের মধ্যে LR-9-25 লাইনটি উচ্চ ফলনশীল হওয়ায় পরবর্তীতে জিংক ও আয়রনের মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য কানাডাতে পাঠানো হয়। এটি উচ্চ মাত্রায় আয়রন ও জিংক সমৃদ্ধ হওয়ায় ২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগবালাই ও পোকামাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগত মান মূল্যায়ন কর হয়। জার্মপ্লাজমটি একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৫ সালে বারি মসুর-৮ হিসেবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়। এটি দেশে আয়রন ও জিংকের ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। জাতটি সারাদেশে চাষাবাদযোগ্য।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের গোড়ায় খয়েরী পিগমেন্ট বিদ্যমান।
- বীজ গোলাকার, ধূসর ও হালকা কাল ফোটা যুক্ত।
- স্টেমফাইলিয়ামব্লাইট (পাতাঝলসানো) রোগ প্রতিরোধী ।
- ১০০টি বীজের ওজন ১.৯০-২.২০ গ্রাম।
- জীবন কাল ১১০-১১৫ দিন।
- গড় ফলন ২২০০-২৩০০ কেজি/হেক্টর।
- নাবীতে বপন যোগ্য (নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমির ধরন ও জমি তৈরি: দো-আঁশ প্রকৃতির মাটি মসুর চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জমিতে উপযুক্ত 'জো' এলে ২/৩ টি গভীরভাবে (৫/৬ ইঞ্চি) চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে।

বপনের সময় : কার্তিক মাসের ১৫-৩০ তারিখ (নভেম্বর ০১-১৫) এর মধ্যে বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের পরিমাণ ও বপন পদ্ধতি: জমিতে উপযুক্ত 'জো' অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৩০-৩৫ কেজি (প্রতি বিঘায়, ৩৩ শতাংশে ৪-৫ কেজি) বীজের প্রয়োজন হয়। সারিতে ও ছিটিয়ে বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে ২৫ সে. মি. দূরে দূরে সারি করতে হয়। সারিতে বপন করলে আন্তঃপরিচর্যা করতে সুবিধা হয়।

সার প্রয়োগ: শেষ চাষের সময় বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৪ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ, ১৩ কেজি টিএসপি ও ৭ কেজি জীপসাম শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে বোরনের অভাব থাকলে বিঘাপ্রতি ১.০ থেকে ১.৫ কেজি বরিক এসিড/বোরাক্স শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: জমিতে আগাছা থাকলে বপনের ৩০-৩৫ দিনের পর হাত দ্বারা আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া জমিতে রসের অভাবে গাছের বৃদ্ধি কম হলে বৃদ্ধি পর্যায়ে একবার হালকা সেচ দিতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে কোনক্রমেই পানি জমতে না পারে। এজন্য জমির আইল কেটে রাখতে হবে, যাতে করে হঠাৎ বৃষ্টি হলে সহজেই পানি নেমে যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ: সাধারণত বীজ বপনের ১১০-১১৫ দিন পর মসুর গাছ পেকে যায়। গাছ পেকে শুকিয়ে গেলে ফসল কেটে, শুকিয়ে মাড়াই, ঝাড়াই ও পরিষ্কার করে বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে (যেন বীজের আর্দ্রতা ৯-১০% হয়) বায়ুরোধক পাত্রে বা পলিথিন লাইনিংযুক্ত বস্তা, টিন বা ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি ৫০-১০০ কেজি বীজের জন্য একটি ফসটকসিন ট্যাবলেট (গ্যাস বড়ি) বীজ সংরক্ষিত বায়ুরোধী পাত্রে ঢুকিয়ে রাখলে বীজ পোকার আক্রমণ মুক্ত থাকবে। তবে বীজ যে পাত্রেই রাখা হোকনা কেন তা মেঝে থেকে উপরে রাখতে হবে।

বারি মুগ-৭

ডাল গবেষণা কেন্দ্রের সংগৃহীত জার্মপ্লাজম/ক্রসিং ম্যাটেরিয়াল (Crossing material) হতে অনেকগুলো স্বল্প জীবনকালীন লাইন সংগ্রহ করে IAPP প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন করা হয়। খরিফ-১ মৌসুমে গম ও আমন ধানের মধ্যবর্তী পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় এনে ডাল ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে সংগৃহীত লাইনগুলো ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়াও খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমেও মূল্যয়ন করা হয়।

দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর BMX-97024-13 (VC-3960A-88 x VC - 6173C) জার্মপ্লাজমটি ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগতমান মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৫ সালে এই লাইনটি বারি মুগ-৭ হিসেবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়। এই জাতটির মাধ্যমে দেশের পতিত ও প্রচলিত জমি ডাল আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং দেশের ডালের ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সে.মি.।
- একই সময়ে প্রায় সব শুঁটি পরিপক্ক হয়। তবে খরিফ-১ ও বিলম্ব রবি মৌসুমে আবাদ করলে মাটিতে রস বেশি থাকে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি হওয়ায় পর্যায়ক্রমে ফুল আসে ও ফল ধরে।
- পাতা ও বীজের রঙ গাঢ় সবুজ এবং পাতা চওড়া।
- ফুল আসার পরে দৈহিক বৃদ্ধি কম।
- দানার আকার বড়। প্রতি ১০০ বীজের ওজন ৪৯-৫১ গ্রাম।
- খরিফ-১, খরিফ-২ এবং বিলম্ব রবি ৩ মৌসুমেই আবাদযোগ্য।
- হলুদ মোজাইক ভাইরাস এবং পাতায় দাগ রোগ সহনশীল।
- জীবন কাল ৬০-৬২ দিন।
- হেক্টরপ্রতি ফলন ১৭০০-১৯০০ কেজি।

বারি মুগ-৮

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে সংগ্রহ করে IAPP এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মুগের জাত নির্বাচন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২ সাল হতে পর্যায়ক্রমে মূল্যায়ন করা হয়। খরিফ-১ মৌসুমে গম ও আমন ধানের মধ্যবর্তী পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় এনে ভাল ফলনের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে অনেকগুলো স্বল্প জীবনকালীন লাইন ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়াও খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমেও মূল্যায়ন করা হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি (LM-101) ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগতমান মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সম্ভাবনাময় লাইন

হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৫ সালে এই লাইনটি বারি মুগ-৮ হিসেবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়। এই জাতটির মাধ্যমে দেশের পতিত ও প্রচলিত জমি ডাল আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং দেশে ডালের ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সে.মি.।
- একই সময়ে প্রায় সব শুঁটি পরিপক্ক হয়। তবে খরিফ-১ ও বিলম্ব রবি মৌসুমে আবাদ করলে মাটিতে রস বেশি থাকে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি হওয়ায় পর্যায়ক্রমে ফুল আসে ও ফল ধরে।
- পাতার রঙ হালকা সবুজ
- ফুল আসার পরে দৈহিক বৃদ্ধি কম।
- দানার আকার ছোট। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ২৫-৩২ গ্রাম।
- খরিফ-১, খরিফ-২ এবং বিলম্ব রবি ৩ মৌসুমেই আবাদযোগ্য।
- হলুদ মোজাইক ভাইরাস এবং পাতায় দাগ রোগ সহনশীল।
- জীবন কাল ৫৮-৬০ দিন।
- হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬০০-১৭০০ কেজি।

উৎপাদন প্রযুক্তি

শস্য পরিক্রমা: বারিমুগ-৭ ও বারি মুগ-৮ জাতটি গম-মুগডাল-ধান শস্য পরিক্রমায় খরিফ-১ মৌসুমের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হলেও খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমের জন্য বেশ উপযোগী।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সুনিষ্কাশিত বেলে দো-আঁশ মাটি মুগডাল চাষের জন্য বেশি উপযোগী। বীজ বপনের পূর্বে ২-৩টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে।

সারের মাত্রা: জমি খুব অনুর্বর না হলে সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। তবে অনুর্বর জমিতে হেক্টরপ্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৮৫ কেজি টিএসপি, ৩৫কেজি এমপি ও জৈব সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বৃহত্তর রংপুর,

দিনাজপুর, বগুড়া ও তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহের মাটিতে মুগ চাষ করতে হলে অন্যান্য সারের সাথে হেক্টরপ্রতি ৭-১০ কেজি বরিক এসিড/বোরাক্স প্রয়োগ করতে হবে।

বপনের সময় পদ্ধতি: তিন মৌসুমেই বপন করা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে- মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ এবং খরিফ-২ মৌসুমে- আগস্ট দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এবং বিলম্ব রবি মৌসুমে- মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বীজ বপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ছিটিয়ে ও সারি উভয় পদ্ধতিতেই বপন করা যায়। সারি করে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭-৮ সে.মি. বজায় রাখতে হবে।

বীজের পরিমাণ: হেক্টরপ্রতি ২২-২৫ কেজি (বারি মুগ-৭) এবং ১৮-২০ কেজি (বারি মুগ-৮) এর বীজের প্রয়োজন।

আন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

মুগডালের জন্য সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে খরিফ-১ মৌসুমে বপনের পূর্বে হালকা সেচ দিয়ে বীজ বপন করতে হবে। পরবর্তীতে রসের অভাব হলে গাছের বাড়ন্ত অবস্থায় ১-২টা হালকা সেচের প্রয়োজন হতে পারে। সেচের পর মাটির উপরিভাগ শক্ত হলে আচড়া বা নিড়ানী দিয়ে তা ভেঙ্গে দিতে হবে। ভাল ফলনের জন্য মুগ ডাল বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করতে হবে। পরিশেষে শুঁটি সংগ্রহ করে গাছ মাটির সংগে মিশিয়ে দিলে সবুজ সার তৈরি হয় যা পরবর্তী ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়।

ফসল সংগ্রহ : শুঁটি পরিপক্ক হলে কালচে রঙ ধারণ করে। শুঁটি কালচে রঙ হলে পরিষ্কার সূর্যালোকের দিনে শুঁটি সংগ্রহ করতে হবে।

আমের জাত

বারি আম-১১

বারি আম-১১ বছরে তিনবার ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও ছড়ানো। নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে গাছে মুকুল আসে এবং মার্চ-এপ্রিল, মে-জুন এবং জুলাই-আগস্ট মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের আকার লম্বাটে আকৃতির এবং পৃষ্ঠাদেশ মসৃণ। পাকা ফল হলুদ বর্ণের, ফলের গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলুদ, মধ্যম রসালো, মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৮.৫%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৭%। ৬ বৎসর বয়স্ক গাছের গড় ফলন ৭.৯৩ কেজি। ফলের সংরক্ষণকাল তুলনামূলকভাবে বেশি। দেশের সকল অঞ্চলের জন্য চাষ উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: আম প্রধানত গ্রীষ্ম মণ্ডলের ফল। তবে এর বাণিজ্যিক চাষ অবগ্রীষ্ম মণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৪০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে আম জন্মে। আমের জন্য বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২০-৩০°সেলসিয়াস সবচেয়ে উপযোগী। যে কোন ধরনের মাটিতেই আমের চাষ করা গেলেও গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দো-আঁশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম। আমের জন্য মাটির অম্লতা ৫.৫-৭.৫ সর্বোত্তম।

বংশ বিস্তার: বীজ দ্বারা সহজেই আমের বংশ বিস্তার করা যায়। তবে এতে মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে না। এজন্য অঙ্গজ পদ্ধতিতে আমের বংশ বিস্তার করা হয়। ১০-১২ মাস বয়স্ক রুটস্টক এর সাথে ৩-৪ মাস বয়স্ক সায়ন ভিনিয়ার/ক্লেফট পদ্ধতিতে কলম করা হয়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: বর্ষার পানি দাঁড়ায় না এবং সারাদিন সূর্যের আলো পড়ে এমন উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। পাহাড়ী এলাকায় জমির ঢাল ৪৫ ডিগ্রির কম হতে হবে। সমতল ভূমিতে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে টেরেস তৈরি করে চারা/কলম রোপণ করা হলে ভূমি ক্ষয় কম হবে।

চারা/কলম নির্বাচন ও রোপণ পদ্ধতি: রোপণের আগে আমের চারা অবশ্যই ভাল জাতের ও কলমের হতে হবে। এক বছর বয়স্ক সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা নির্বাচন করতে হবে। সমতল ভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ী ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতি উত্তম।

রোপণের সময়: জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় মাস গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো যায় তবে অতিরিক্ত বর্ষায় গাছ না লাগানোই ভাল।

গর্ত তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৮ মিটার × ৮ মিটার থেকে ১০ মিটার × ১০ মিটার দূরত্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের মাটির সাথে ২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ৩০০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বরিক এসিড ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে পানি দিতে হবে।

চারা/কলম রোপণ: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর ১ বছর বয়সের নির্বাচিত চারা গোড়ার মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে চারদিকের মাটি দিয়ে গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা দমন: বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষা শেষ হয়ে আসার পরপরই জমিতে চাষ দিয়ে অতি সহজেই আগাছা দমন করা যাবে। পাহাড়াঞ্চলে হাসুয়ার সাহায্যে নিয়মিত আগাছা কেটে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছকে সুন্দর কাঠামো দেওয়ার জন্য রোপণের ২-৩ বছর পর গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার কাণ্ড রেখে সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার শেষে মরা, রোগাক্রান্ত, শুকনো ও দুর্বল ডালপালা কেটে দিতে হবে। এছাড়া গাছ ঝোপালো হলে অতিরিক্ত ডালপালা ছাঁটাই করে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছের মুকুল ভাঙন: কলমের গাছের বয়স চার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	১৫	২০	২৫	৩০	৪০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২৫০	৫০০	৭৫০	১০০০	১৫০০	২০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০	৭৫০	১০০০
এমওপি(গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৪০০	৫০০	৮০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিংক সালফেট(গ্রাম)	১০	১০	১৫	১৫	২০	২৫
বরিক এসিড	২০	২০	৩০	৩০	৪০	৫০

উল্লিখিত সার ২ ভাগ করে প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট এক বছর পর পর প্রয়োগ করলেই চলবে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

পরগাছা দমন: আম গাছে বিভিন্ন ধরনের পরগাছা হতে দেখা যায়। এসব পরগাছা খাদ্য-রস শোষণ করে আম গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়। এগুলো দেখামাত্র দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ: চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছে মুকুল বের হবার ৩ মাস আগে থেকে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে। আমের মুকুল ফোটার শেষ পর্যায়ে ১ বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আর একবার পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

অনুন্নত আম গাছকে উন্নত জাতে রূপান্তর: ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুন্নত আম গাছের সমস্ত প্রশাখা কেটে দিতে হবে। জুন-জুলাই মাসে কর্তিত প্রশাখা থেকে উৎপন্ন ডালসমূহে ভিনিয়ার/ক্লেফট পদ্ধতিতে উন্নত জাতের কলম করতে হবে। কলমের নিচ থেকে কুশি বের হলে সেগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। এভাবে ২-৩ বছরের মধ্যে অনুন্নত আম গাছটি উন্নত জাতে রূপান্তরিত হবে।

ফল সংগ্রহ: উপযুক্ত পর্যায়ে ও সুষ্ঠুভাবে ফল সংগ্রহের উপর ফলের পক্কতা, গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। অপরিণত অবস্থায় আম সংগ্রহ করলে ফলের ভেতরে সাদাটে শক্ত অংশ দেখা যায়, অম্লতার পরিমাণ বাড়ে এবং জাতের প্রকৃত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে বেশি পাকা আম সংগ্রহ করলে পোকা ও রোগজীবাণুর সংক্রমণ বেশি হয়, সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায় এবং দূরবর্তী স্থানে পরিবহন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু লক্ষণ দেখে আমের পূর্ণতা প্রাপ্তি শনাক্ত করা যায়। যেমন- ক) আমের উপরের অংশের অর্থাৎ বোঁটার নিচের ত্বক সামান্য হলুদাভ রঙ ধারণ করে; খ) পরিপক্ক আম পানিতে ডুবালে তা সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়; গ) প্রাকৃতিকভাবে দুএকটা আধপাকা আম গাছ থেকে পড়া

আরম্ভ হয়; ঘ) আমের বোঁটা থেকে যে আঠা বের হয় তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং একটা স্বচ্ছ বিন্দুর আকারে জমা হয়। গাছ ঝাকি দিয়ে আম না পেড়ে ছোট গাছ থেকে হাত দিয়ে এবং বড় গাছ থেকে জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে পাকা আম সংগ্রহ করা ভাল। গাছের নিচে বড় কাপড় বা চট ধরে রেখে তাতে আম সংগ্রহ করা উত্তম। গাছের নিচে সাময়িকভাবে রাখতে হলে খড়, খবরের কাগজ বা আম পাতা বিছিয়ে তার উপর আম রাখা উচিত।

ফলন: আমের ফলন বয়স ও জাতভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়া পরিচর্যা, জলবায়ু, পোকামাকড় প্রভৃতি বিষয়ও এর জন্য দায়ী। সাধারণত গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে ফলন বৃদ্ধি পেলেও ৫০ বছরের পর ফলন কমতে থাকে। কলমের গাছে ৪ বছর বয়সে প্রায় ২০-২৫ টি, ১০ বছর বয়সের গাছে ৪০০-৬০০ টি এবং ২০-৪০ বছর বয়স্ক গাছে ১০০০-৩০০০ টি আম ধরে থাকে।

কাঁঠালের জাত

বাংলাদেশে কাঁঠালের অসংখ্য জাত রয়েছে। কিন্তু জাতগুলোর নির্দিষ্ট কোন নাম নেই। এদেশে চাষকৃত জাতগুলোকে শাঁসের বুনটের উপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা: খাজা বা চাওলা (শাঁস শক্ত ও কচকচে), গালা বা রসা (শাঁস অত্যন্ত নরম ও রসালো) এবং দু-রসা বা আধরসা (শাঁস মাঝারী শক্ত ও রসালো)। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি কাঁঠাল-২ ও বারি কাঁঠাল-৩ নামে কাঁঠালের দু'টি উন্নত জাত কৃষক পর্যায়ে চাষের জন্য মুক্তায়িত করেছে। জাত দু'টির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

বারি কাঁঠাল-২

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল অমৌসুমী জাত। গাছ খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি ৫৪-৭৯টি ফল ধরে যার ওজন ৩৮০-৫৭৯ কেজি। ফল মাঝারী (৬.৯৫ কেজি), ও দেখতে আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২১%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৩৮-৫৮ টন। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

বারি কাঁঠাল-৩

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল বারমাসি জাত। গাছ বড় ও ঝোপালো। সেপ্টেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত গাছ হতে ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি ২১৯-২৪৫টি ফল ধরে যার ওজন ১১৬৫-১৫০৪ কেজি। ফল মাঝারী (৫.৪৩ কেজি), লালচে সবুজ ও আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩.৬%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫২.৫%, হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১৩৩.২ টন/বছর। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

বংশ বিস্তার: সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকেই চারা তৈরি করা হয়। যদিও এতে মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য হুবহু বজায় থাকে না তথাপি ফলনে বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। ভাল পাকা কাঁঠাল থেকে পুষ্ট বড় বীজ বের করে ছাই মাখিয়ে ২/৩ দিন ছায়ায় শুকিয়ে বীজতলায় বপন করলে ২০-২৫ দিনে চারা গজাবে। দশ থেকে বার মাসের চারা সতর্কতার সাথে তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এছাড়া অঙ্গজ বংশ বিস্তার পদ্ধতি, যেমন- ফাটল কলম (Cleft grafting), চারা কলম (Epicotyle grafting) এবং টিস্যু কালচার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ৪-৯ মাস বয়সের রুটস্টকের উপর ৩-৪ মাস বয়সের সায়ন ফাটল পদ্ধতিতে কলম করা হলে সফলতার হার ও কলমের বৃদ্ধি বেশি হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: কাঁঠাল গাছ জলাবদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। স্বল্প সময়ের জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়। এ জন্য বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না বা বন্যার পানি উঠে না এমন উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি কাঁঠাল চাষের জন্য নির্বাচন করা আবশ্যক। বাগান তৈরির জন্য ২-৩টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নেয়া ভাল। পাহাড়ী এলাকায় জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি: সমতল ভূমিতে কাঁঠাল বাগান স্থাপনায় আয়তাকার, বর্গাকার বা কুইনকাক্স পদ্ধতি এবং পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য কন্টুর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

রোপণের সময়: চারা বা কলম রোপণের সময় মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-শ্রাবণ (জুন-আগস্ট) মাস। ভাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় চারা/কলম রোপণ না করা ভাল।

রোপণের দূরত্ব: কাঁঠালের চারা লাগানোর ক্ষেত্রে গাছ ও সারির দূরত্ব ১০ মিটার × ১০ মিটার এবং হেক্টরপ্রতি চারার সংখ্যা ১০০টি। কুইনকান্স পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতির তুলনায় প্রায় দ্বিগুন গাছ লাগানো যায় এবং ১৫-২০ বছর পর্যন্ত অধিক ফল আহরণ করা সম্ভব। এছাড়া অতিরিক্ত গাছ বিক্রি করে বাড়তি আয় করা যায়।

গর্ত তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ১০ মিটার দূরত্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ২০-২৫ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ২০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে এ অবস্থায় ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে ।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। প্রয়োজনমত পানি সেচ ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: ছোট অবস্থায় চারা/কলম লাগানোর পর অপ্রয়োজনীয় ছোট ছোট শাখা প্রশাখা কেটে দিলে কাণ্ড তৈরিতে সহায়ক হয়। বড় গাছের মরা ডাল, অভ্যন্তরের ছোট ছোট শাখা প্রশাখা এবং পূর্ববর্তী বছরের ফলের বোঁটার অবশিষ্ট অংশে প্রুনিং করে দিলে ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। বড় ডাল কাটা গাছের জন্য ক্ষতিকর।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখা দরকার। চারা গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত নিড়ানী দিতে হবে এবং ফলন্ত গাছের ক্ষেত্রে বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: কাঁঠাল গাছে বছরে দু'বার সার প্রয়োগ করা উচিৎ। প্রথম কিস্তি বর্ষা মৌসুম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং পরবর্তী কিস্তি বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। নিম্নের ছকে কাঁঠাল গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হ'ল।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-৩ বছর	২০	৪০০	৪০০	৩৫০	৮০
৪-৬ বছর	২৫	৬০০	৫৫০	৪৫০	১০০
৭-১০ বছর	৩০	৮০০	৭০০	৫৫০	১৫০
১১-১৫ বছর	৪০	১০০০	৯০০	৬৫০	১৬০
১৫ বছরের উর্দ্ধে	৪০-৫০	১২০০	১৬০০	১২৫০	৩০০

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত এই শুকনো মৌসুমে ১৫ দিন অন্তর রূপান্তরিত বেসিন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিলে কচি ফল ঝরা কমে, ফলন ও ফলের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। কাঁঠাল গাছ জলাবদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। স্বল্প সময়ের জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়। এজন্য বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ফল ব্যাগিং: গাছে ফল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিচের দিকে খোলা পলিথিনের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিলে ফল ছিদ্রকারী পোকা ও নরম পচা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ফলের রঙ ও আকার-আকৃতি আকর্ষণীয় হয়।

ফল সংগ্রহ: পৌষ-মাঘ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) মাসে সাধারণত কাঁঠাল গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মে-জুলাই) মাসে ফল পাকে। তবে কোন কোন জাতের গাছে বছরে দু'বার ফল আসে। প্রথম বার ফুল আসে পৌষ-মাঘ মাসে এবং দ্বিতীয় বার ফুল আসে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। ফল পাকে যথাক্রমে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও পৌষ-মাঘ মাসে। কাঁঠালের ফল একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই যেটা যখন পরিপক্ক হয় সেটা তখনই গাছ থেকে পাড়তে হবে। পরিপক্ক হলে ফলের গায়ের কাঁটা ক্রমশ চ্যাপ্টা হতে থাকে এবং কাঁটার অগ্রভাগ কাল হয়ে যায়। ফলের গায়ে আঘাত করলে ড্যাবড্যাব শব্দ হয়। পরিপক্ক বা পাকা ফল খুব সাবধানে গাছ থেকে নামাতে হবে যাতে মাটিতে পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এবং আঠা ফলের গায়ে না লাগে।

ফলন: একটি পূর্ণ বয়স্ক কাঁঠাল গাছে ২০০টি পর্যন্ত ফল হয়। কাঁঠালের গড় ওজন এক কেজি থেকে ২০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। কোন কোন কাঁঠাল ৪০-৫০ কেজি পর্যন্ত হয়। সঠিকভাবে পরিচর্যা এবং রোগবালাই ও অনিষ্টকারী পোকামাকড় দমনের ব্যবস্থা করা হলে গাছপ্রতি ১০০০ কেজি বা আরও অধিক পরিমাণে কাঁঠাল আহরণ করা সম্ভব।

কুলের জাত

টক-মিষ্টি উভয় স্বাদযুক্ত কুল বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি বিদ্যমান। শীতকালে দেশীয় ফলের অপ্রতুলতার সময় এদেশে ফলের চাহিদা পূরণে কুল বিশেষ ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতটি হল বারি কুল-৪।

বারি কুল-৪

উচ্চ ফলনশীল মাঝ মৌসুমী জাত। গাছ খাটো, মোটামুটি খাড়া। ভাদ্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং মাঘের শুরুতে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল আকারে মাঝারী (৩৬ গ্রাম), ফলের আকার ওভাল ও আকর্ষণীয় হলুদাভ সবুজ বর্ণের। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% ও খেতে কচকচে, খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১৪%) ও কষ্টিভাব বিহীন। গাছপ্রতি ফলন ১৮৮-২১০ কেজি। দেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু কুল চাষের জন্য সর্বোত্তম। এতে কুলের ফলন ও গুণগতমান দুই-ই ভাল হয়। তবে আর্দ্র ও ঠান্ডা আবহাওয়ায়ও সফলভাবে কুল চাষ করা সম্ভব। উঁচু সুনিষ্কাশিত বেলে দোঁ-আঁশ অথবা দো-আঁশ মাটি কুল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে সব ধরনের মাটিতেই কুলের চাষ করা যায়। অন্যান্য প্রধান ফল ও ফসলের জন্য উপযোগী নয় এ ধরনের অনুর্বর জমিতে এমনকি উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতেও সন্তোষজনকভাবে কুলের চাষ করা সম্ভব।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিৎ। এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে। বাড়ির আশে-পাশে, পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে কুলের চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর জন্য ৪-৬ মিটার দূরত্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি এবং ২৫০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে।

রোপণের সময়: জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে উলট-পালট করে নিতে হবে। রোপণের পর চারাটিকে একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং গোড়ায় পানি দিতে হবে।

সার প্রয়োগ: সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীলতার জন্য গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সারের মাত্রা নির্ভর করে গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার উপর। বিভিন্ন বয়সের গাছে সারের মাত্রা

গাছের বয়স	গাছপ্রতি সারের পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২ বছর	১০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৪ বছর	১৫	৫০০	৪০০	৪০০
৫-৬ বছর	২০	৭৫০	৭০০	৭০০
৭-৮ বছর	২৫	১০০০	৮৫০	৮৫০
৯ বা তদূর্ধ্ব	৩০	১২৫০	১০০০	১০০০

এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সে সব সারও প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখিত সার সমান দুই কিস্তিতে জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর বা রাস্তার ধারে লাগানো গাছে শাবল দ্বারা গর্ত করে তাতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের গোড়া থেকে কতটুকু দূরে এবং কতদূর পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা যাবে তা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর। সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ১-১.৫ মিটার দূর থেকে শুরু করে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা হয়।

পানি সেচ ও পরিচর্যা: শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সেচ দিলে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুল বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ডালপালা ছাঁটাই: নতুন রোপণকৃত বা কলমকৃত গাছে আদিজোড় হতে উৎপাদিত কুশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা চলবে না। এক থেকে দেড় মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫ টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। কুল গাছে সাধারণত চলতি বছরের নতুন গজানো প্রশাখায় ভাল ফল ধরে। এজন্য প্রতিবছর ফল আহরণের পরপরই ডাল ছাঁটাই আবশ্যক। চারা রোপণের বা কুঁড়ি সংযোজনের পর ৩/৪ বছর মধ্যম ছাঁটাই অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রশাখা এবং শাখার মাথার দিক থেকে ৫০-৬০ সে.মি.পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে। গাছ কাঙ্খিত আকারে আসার পর এক বছর বয়সী ডাল গোড়ার দিকে ২০-৩০ সে.মি. পরিমাণ রেখে সম্পূর্ণ ডালটাই ছেঁটে দিতে হবে। এছাড়া মরা, দুর্বল, রোগাক্রান্ত এবং এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত ডাল ছেঁটে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: সঠিক পরিপক্ক অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা খুবই গুরত্বপূর্ণ। অপরিপক্ক ফল আহরণ করা হ'লে তা কখনই কাঙ্খিত মানসম্পন্ন হবে না। অতিরিক্ত পাকা ফল নরম এবং মলিন বর্ণের হয়ে যায়। এতে ফলের সংরক্ষণ গুণ কমে যায় এবং ফল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ফল যখন হালকা হলুদ বা সোনালী বর্ণ ধারণ করবে এবং এর গন্ধ ও স্বাদ কাঙ্খিত অবস্থায় পৌছবে তখনি কুল সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহকালে যাতে ফলের গায়ে ক্ষত না হয় এবং ফল ফেটে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সকাল বা বিকেলের ঠাণ্ডা আবহাওয়া ফল আহরণের জন্য অধিক উপযোগী।

কদবেলের জাত

কদবেল বা Elephant's foot apple (*Feronia limonia*) রুটাসি (Rutaceae) পরিবারভুক্ত একটি বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি বাংলাদেশে একটি অতি পরিচিত ফল। কাঁচা ও পাকা কদবেল খাওয়া হয়। এ ছাড়া আচার, চাটনি বানাতেও কদবেল ব্যবহৃত হয়। কদবেল একটি পত্রমোচক বৃক্ষ কিন্তু পাতার গঠন বেল থেকে ভিন্ন। পাতার বোঁটায় পাখা থাকে। বাংলাদেশে বাগান আকারে কদবেলের চাষ না হলেও গ্রামের আনাচে কানাচে কদবেলের গাছ চোখে পড়ে। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কদবেল বেশি জন্মে থাকে। ফল গোলাকার, আকারে টেনিস বলের ন্যায়, ত্বক খসখসে। শাঁস টক, সুগন্ধী এবং পাকার পরও শক্ত থাকে। কদবেল আহরণের সময় অন্যান্য ফল তেমন পাওয়া যায় না বিধায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং অমৌসুমে (Lean period) দেশি ফলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

জলবায়ু ও মাটি: কদবেল খুবই কষ্ট সহিষ্ণু গাছ এবং জলাবদ্ধ অম্ল-ক্ষারীয় (পি এইচ ৫-১০) এবং কংকরময় মাটিতে জন্মানো সম্ভব। এমনকি কর্দমাক্ত মাটি যেখানে অন্যান্য ফসল জন্মানো যায় না সেখানেও কদবেলের গাছ জন্মানো সম্ভব। নিরক্ষীয় ও উপ-নিরক্ষীয় উভয় এলাকাতেই এর চাষ হচ্ছে। সাধারণভাবে কদবেলের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ প্রয়োজন। পত্রমোচক বলে নিম্ন তাপমাত্রায় কদবেল সহজে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। সুনিষ্কাশিত হলে যে কোন রকমের মাটিতে চাষ করা যায়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি কদবেল-১ নামে কদবেলের একটি জাত উদ্ভাবন করেছে, জাতটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার উৎপাদন প্রযুক্তি নিচে উল্লেখ করা হলো:

বারি কদবেল-১

নিয়মিত প্রচুর ফল প্রদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মাঝারী, ছড়ানো আকৃতির ঝোপালো। মধ্য বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফল গোলাকৃতির, আকারে বড় এবং পাকা ফল সবুজাভ বাদামী বর্ণের। ফলের শাঁস গাঢ় বাদামী ও মধ্যম রসালো, আঁশের পরিমাণ কম, স্বাদ টক-মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৮.৬৭%)। ফলের ওজন ৩৪৪ গ্রাম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৯.১৫%। গাছপ্রতি ২০০০-২৫০০টি ফল হয়। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন। জাতটি দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বংশ বিস্তার

যৌন ও অযৌন দুই উপায়েই কদবেলের বংশ বিস্তার করা সম্ভব। বাংলাদেশে সাধারণত বীজ দিয়েই কদবেলের বংশ বিস্তার করা হয়। পর-পরাগায়িত বলে বীজের গাছে মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে না। এজন্য উৎকৃষ্ট জাতের চারা উৎপাদন করতে চাইলে গুটি কলম অথবা কুঁড়ি সংযোজন/জোড় কলম পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। জুন-জুলাই মাসে ১ বা ২ বছরের চারা আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করে এর উপর তালি কলম (Patch budding) অথবা ভিনিয়ার/ফাটল কলমের মাধ্যমে সফলভাবে বংশ বিস্তার করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: পূর্ণ রৌদ্রযুক্ত স্থানে কদবেলের চাষ করা উচিত। কদবেল চাষের জন্য বর্ষার পানি জমে না এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। এর শিকড় মাটির খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করে না তাই জমিতে পানির তল খুব বেশি নিচে থাকা ক্ষতিকর। বাগান আকারে কদবেল আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুঁড়ি উপড়ে ফেলতে হবে। উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি, রোপণের সময় ও দূরত্ব: কদবেল গাছ বাগান আকারে করতে চাইলে বর্গাকার পদ্ধতি অনুসরণ করা ভাল। উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ প্রণালী অবলম্বণ করা যেতে পারে। বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-আষাঢ় (মে- জুলাই) মাস কদবেলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করা ভাল। তবে বর্ষার শেষের দিকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো

চলে। বাগান আকারে কদবেলের চাষ করতে চাইলে ৬ মিটার × ৬ মিটার দূরত্বে এক বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত।

মাদা তৈরি: চারা/কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুঁড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ঠিক খাড়াভাবে চারা রোপণ করতে হবে । চারা রোপণের সময় মাটি নিচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে। চারাটি একটি বা দুটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পর প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। এমতাবস্থায় মালচিং দিলে খুবই ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ: সাধারণভাবে কদবেলের চারা/কলমের মধ্যে ছোট অবস্থায় ঝোপালো হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রোপণের পর গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এর ওপর থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে দিতে হবে যাতে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের ছোট ছোট ডালপালা ছেটে দেয়া দরকার।

গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্খিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)			
	১-৪	৫-১০	১১-১৫	১৫ এর ঊর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৪৫০-৬০০	৬০০-৭৫০	১০০০
টি এস পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (ফল আহরণের পর) এবং শেষ কিস্তি শীতের শেষে (মাঘ-ফাল্গুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে

মিশিয়ে গাছের চারদিকে (গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত) ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: চারা রোপণের পর ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ: ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকতে শুরু করে। আমাদের দেশে সাধারণত অপরিপক্ক ফল আহরণ করে কয়েকদিন রোদে রেখে পাকানো হয়। এতে ফলের কাঙ্খিত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না এবং অনেক ফল নষ্ট হয়। ফল পরিপক্ক হলে এর ত্বক ধুসর মলিন বর্ণ ধারণ করে এবং ফলের বোঁটা আলগা হয়ে যায়। সামান্য ঝাকুনিতেই ফল ঝরে পড়ে। গাছে ঝাকি দিয়ে ফল আহরণ করা উচিৎ নয়। এতে অনেক ফল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ফেটে নষ্ট হয়।

জলপাইয়ের জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি জলপাই-১ নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছে, এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-

বারি জলপাই-১

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মধ্যম আকৃতির, ছড়ানো ও কিছুটা ঝোপালো। কার্তিক মাসের শেষার্ধ থেকে পৌষ মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। ফল তুলনামূলকভাবে বড় (গড় ওজন ৪৬.৩৩ গ্রাম), পাকা ফলের রঙ হালকা সবুজ, শাঁস সাদা, এবং মধ্যম টক (ব্রিক্সমান ৬.২০%)। বীজ খুব ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৪.৯৯%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য। গাছপ্রতি ১৯০০-২০০০টি ফল ধরে যার গড় ওজন ১২৫ কেজি।

বংশ বিস্তার

বীজের মাধ্যমে সাধারণত বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। বীজাবরণ খুব শক্ত বিধায় বীজ ২৪-৩০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। বীজ থেকে

উৎপাদিত চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে না এবং এতে ফল আসতেও অধিক সময় লাগে। পক্ষান্তরে কলমের চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং এতে তাড়াতাড়ি ফল আসে। সাধারণত ১২-১৩ মাস বয়সের আদিজোড়ের সাথে ৩-৪ মাস বয়সের উপজোড় ভিনিয়ার/ফাটল পদ্ধতিতে কলম করা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ বা মে- জুন মাস কলম করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: বন্যার পানি দাড়ায় না এমন ধরনের উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি জলপাইয়ের জন্য নির্বাচন করতে হবে। বাগান আকারে চাষ করার ক্ষেত্রে চাষ ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। দীর্ঘজীবি আগাছা বিশেষ করে উলু ঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়: মে-অক্টোবর মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই চারা রোপণ করা যেতে পারে

গর্ত তৈরি: কলম রোপণের অন্তত ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ মিটার × ৭ মিটার দূরত্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তপ্রতি ১৫-২০ কেজি পচা গোবর, ৩০০-৪০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০-৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি গর্তের ঠিক মাঝখানে এমনভাবে বসাতে হবে, যেন চারার গোড়া ঠিক খাড়া থাকে এবং কোনভাবে আঘাত পাবার সম্ভাবনা না থাকে। চারা রোপণের পরপর পানি দিতে হবে এবং খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে । তারপর ১-২ দিন অন্তর পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: (বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ)

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-৩ বছর	৪-৬ বছর	৭ - ১০ বছর	১০ বছরের উর্দ্ধে
জৈব সার (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০-৪০০	৪০০-৬০০	৬০০-৮০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	৩০০-৪০০	৪০০-৬০০	৬০০-৮০০	১০০০
এমপি (গ্রাম)	৩০০-৪০০	৪০০-৬০০	৬০০-৮০০	১০০০

উল্লিখিত সার তিন কিস্তিতে শীতের শেষে, বর্ষার আগে ও বর্ষার শেষের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ ও পানি নিষ্কাশন: যেহেতু জলপাই গাছ শুকনো আবহাওয়া ও খরা সহ্য করতে পারে, সেজন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, মাটি ও গাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহ ও গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ পর পর সেচ দিলে ভাল হয়। ফল ধরার পর কমপক্ষে দুবার সেচ দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে গাছের গোড়ায় যাতে জলবদ্ধতা না হয় সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

পুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা

বোরনের অভাব: বোরনের অভাবে ফলের গায়ে দাদের মত খসখসে দাগ পড়ে। এত ফলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় এবং বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

প্রতিকার: বর্ষার শেষের দিকে সার প্রয়োগের সময় গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম হারে বরিক এসিড বা ১০০ গ্রাম হারে বোরাক্স প্রয়োগ করতে হবে। ফলন্ত গাছে ০.২% হারে বরিক এসিড স্প্রে করলেও উপকার পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ: বর্ষার প্রারম্ভে এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের পূর্বে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল পরিপক্ক হয়। পাকার পরও ফল সবুজ থাকে। তাই ফলের আকার বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ডালপালায় ঝাকুনি দিয়ে ফল মাটিতে ফেললে ফল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তবে গাছের নিচে জাল ধরে শাখায় ঝাকুনি দিয়েও ফল সংগ্রহ করা যায়। ভাল যত্ন নিলে পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে প্রতি বছর ২০০-২৫০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

স্ট্রবেরির জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রবর্তণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ট্রবেরির ৩টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। উক্ত জাত সমূহের মধ্যে বারি স্ট্রবেরি-২ ও বারি স্ট্রবেরি-৩ ২০১৫ সালে মুক্তায়িত হয়েছে। জাত দুটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।

বারি স্ট্রবেরি-২

বাংলাদেশে সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি আমেরিকার ফ্লোরিডা হতে সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় অভিযোজন পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই পদ্ধতিতে মুক্তায়ন করা হয়েছে। গাছের গড় উচ্চতা ৩৫ সে.মি. এবং বিস্তার

৪৭-৫২ সে.মি.। ডিসেম্বরের প্রথমে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে। গাছপ্রতি গড় ফলন ৭৪০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৪-১৮ টন। হৃৎপিন্ডাকৃতির ফল বেশ বড় আকারের, প্রান্ত ভাগ চ্যাপ্টা। পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক মধ্যম নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১০%)। ভিটামিন সি-এর পরিমাণ ৭৬ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম। জাতটি ফল প্রদান মৌসুমে সীমিত সংখ্যক runner উৎপাদন করে বিধায় runner অপসারণ জনিত শ্রমিক কম লাগে।

বারি স্ট্রবেরি-৩

বাংলাদেশে সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি আমেরিকার ফ্লোরিডা হতে সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশের আবহাওয়ায় অভিযোজন পরীক্ষাপূর্বক বাছাই পদ্ধতিতে মুক্তায়ন করা হয়েছে। গাছের গড় উচ্চতা ৪০ সে.মি. এবং বিস্তার ৪৫-৫০ সে.মি.। ডিসেম্বরের মাঝামাঝী সময়ে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর শেষ ভাগ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি গড়ে ৩৯টি ফল ধরে। গাছপ্রতি গড় ফলন ৭৭০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। হৃৎপিন্ডাকৃতির ফল বেশ বড় আকারের লম্বাটে, প্রান্ত ভাগ চোখা। পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক তুলনামূলক শক্ত ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১০.৫ %)। ভিটামিন সি-এর পরিমাণ ৭২ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম। জাতটি ফল প্রদান মৌসুমে সীমিত সংখ্যক runner উৎপাদন করে বিধায় runner অপসারণজনিত শ্রমিক কম লাগে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: স্ট্রবেরি মূলত মৃদু শীত প্রধান অঞ্চলের ফসল। কিন্তু গ্রীষ্মায়িত জাত কিছুটা তাপ সহিষ্ণু। দিন ও রাতে যথাক্রমে ২০-২৬° ও ১২-১৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা গ্রীষ্মায়িত জাতসমূহের জন্য প্রয়োজন। ফুল ও ফল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রবি মৌসুম স্ট্রবেরি চাষের উপযোগী। বৃষ্টির পানি জমে না এ ধরনের উর্বর দো-আঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ মাটি স্ট্রবেরি চাষের জন্য উত্তম।

চারা উৎপাদন: স্ট্রবেরি রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। তাই পূর্ববর্তী বছরের গাছ নষ্ট না করে জমি থেকে তুলে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করতে হবে। উক্ত গাছ হতে উৎপন্ন রানারে যখন শিকড় বের হবে তখন তা কেটে ৫০ ভাগ গোবর ও ৫০ ভাগ পলিমাটিযুক্ত পলিথিন ব্যাগে লাগাতে হবে এবং হালকা ছায়াযুক্ত নার্সারিতে সংরক্ষণ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত হতে চারাকে রক্ষার জন্য বৃষ্টির মৌসুমে চারার উপর পলিথিনের ছাউনি দিতে হবে। রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হলে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই জাতের ফলন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা উত্তম।

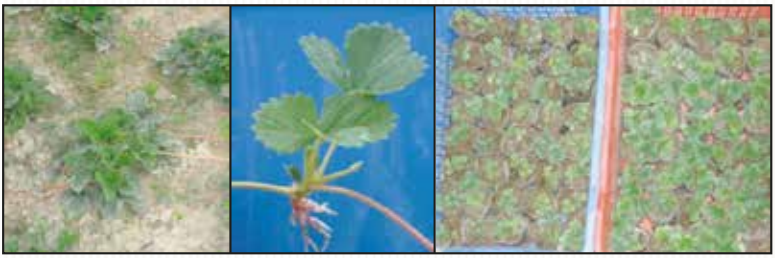

উৎপাদিত রানার স্থানান্তরযোগ্য রানার পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: স্ট্রবেরি উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে এবং আগাছা বিশেষ করে বহু বর্ষজীবি আগাছা অপসারণ করে উত্তমরূপে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের জন্য বেড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ জন্য ১ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সে.মি. উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৪০-৫০ সে.মি. নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৬০ সে.মি. দূরত্বে দুই সারিতে ৪০ সে.মি. দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য অক্টোবর) স্ট্রবেরির চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা চলে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চফলন পেতে হলে স্ট্রবেরির জমিতে নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। হেক্টরপ্রতি ৩০ টন পচা গোবর, ২৫০ কেজি ইউরিয়া, ২০০ কেজি টিএসপি, ২২০ কেজি এমওপি এবং ১৫০ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন পরপর ৪-৫ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে প্রয়োজনমত পানি সেচ দিতে হবে। স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে স্ট্রবেরির ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর স্ট্রবেরির বেড খড় বা কাল পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে উই পোকার আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ৩ মি.লি. ডার্সবান ২০ ইসি ও ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ডিএফ মিশিয়ে ঐ দ্রবণে খড় সুধন করে নিলে তাতে উই পোকার আক্রমণ হয় না এবং দীর্ঘ দিন তা অবিকৃত থাকে। জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিতভাবে রানার বের হয়। উক্ত রানারসমূহ ১০/১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। রানার কেটে না ফেললে গাছের ফুল ও ফল উৎপাদন হ্রাস পায়।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ভাদ্র মাসের মাঝামাঝী সময়ে রোপণকৃত বারি স্ট্রবেরি এর ফল সংগ্রহ পৌষ মাসে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। স্ট্রবেরির সংরক্ষণ কাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর পরই তা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ফল গাদাগাদি অবস্থায় না থাকে। ফল সংগ্রহের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করতে হবে। স্ট্রবেরির সংরক্ষণ গুণ ও পরিবহন সহিষ্ণুতা কম হওয়ায় বড় বড় শহরের কাছাকাছি এর চাষ করা উত্তম।

মাতৃ গাছ রক্ষণাবেক্ষণ: স্ট্রবেরি গাছ প্রখর সৌর-তাপ এবং ভারী বর্ষণ সহ্য করতে পারে না। এজন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা ফল আহরণের পর মাতৃগাছ তুলে টবে রোপণ করে ছায়ায় রাখতে হবে। ফল আহরণ শেষ হওয়ার পর সুস্থ্য-সবল গাছ তুলে পলিথিন ছাউনির নিচে রোপণ করলে মাতৃ গাছকে খরতাপ ও ভারী বর্ষণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যাবে। মাতৃ গাছ থেকে উৎপাদিত রানার পরবর্তি সময়ে চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ড্রাগন ফল

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে অনেক জনপ্রিয় জাতের ড্রাগন ফলের চাষ দেখা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি ড্রাগন ফল-১ নামে ড্রাগন ফলের একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিচের ছকে দেয়া হল।

বারি ড্রাগন ফল-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। বারি উদ্ভাবিত ড্রাগনফলের জাতটি সুস্বাদু এবং এ থেকে প্রচুর সংখ্যক ফল আহরণ করা যায়। ফলের আকার বড় (৩৭৫.১১ গ্রাম), পাকা ফলের খোসা লাল। শাঁস গাঢ় গোলাপী রঙের, রসালো এবং টিএসএস ১৩.২২%। খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১%। বীজসমূহ খুব ছোট কালো ও নরম। ফলে বেটা কেরোটিন ১২.০৬ মিলিমাইক্রো গ্রাম/১০০ গ্রাম এবং ভিটামিন সি ৪১.২৭ মি. গ্রাম/১০০ গ্রাম থাকে। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৯ থেকে ১৫টি এবং ফলন ৩.২২ কেজি/গাছ/বছর এবং ২০.৬ টন/হেক্টর/বছর।

বারি ড্রাগন ফল-১ এর গাছ ও ফল

বংশ বিস্তার: অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে ড্রাগন ফলের বংশ বিস্তার হয়ে থাকলেও মাতৃ গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার কাম্য। বীজ দিয়ে সহজে এ ফলের বংশ বিস্তার করা যেতে পারে। তবে এতে ফল ধরতে একটু বেশি সময় লাগে। এবং হুবহু মাতৃ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। সেজন্য কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা উত্তম। কাটিং এর সফলতার হার প্রায় শতভাগ এবং ফলও তাড়াতাড়ি ধরে। কাটিং থেকে উৎপাদিত একটি গাছে ফল ধরতে ১২-১৮ মাস সময় লাগে। সাধারণত ছয় থেকে এক বছর বয়স্ক গাঢ় সবুজ শাখা হতে ২০ থেকে ৩০ সে.মি. লম্বা টুকরা কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাটিং ৫০ ভাগ পচা গোবর ও ৫০ ভাগ ভিটি বালুর মিশ্রণ দ্বারা পূর্ণ ৮ x ১০ ইঞ্চি আকারের পলি ব্যাগে স্থাপন করে ছায়া যুক্ত স্থানে রেখে দিতে হবে। ৩০ থেকে ৪৫ দিন পরে কাটিং এর গোড়া থেকে শিকড় এবং কাণ্ডের প্রান্ত থেকে নতুন কুশি বেরিয়ে আসবে। তখন এটা মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হবে। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাটিংকৃত কলম সরাসরি মূল জমিতেও লাগানো যায়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: ড্রাগন ফল চাষের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে বহুবর্ষজীবি আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও রোপণের সময়: সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভূজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কাটিং ড্রাগন ফল রোপণ করতে হবে। কাটিং রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল। মধ্য এপ্রিল থেকে থেকে মধ্য অক্টোবর ড্রাগন ফল রোপণের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি: উভয় দিকে ২.৫-৩ মিটার দূরত্বে ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। গর্ত তৈরির ২০-২৫ দিন পর প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ১৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে পানি সেচ দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ৫০ সে.মি. দূরত্বে ৪টি ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের ১ মাস পর থেকে ১ বছর পর্যন্ত ৩ মাস অন্তর প্রতি গর্তে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ৫০ সে.মি. দূরত্বে ৪ টি চারা সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ড্রাগন ফলের গাছ লতানো এবং ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এ জন্য গাছের সাপোর্টের জন্য চারা চরটির মাঝখানে ৪ মিটার লম্বা সিমেন্টের খুটি এমনভাবে পুতে দিতে হবে যাতে করে মাটির উপরে ৩ মিটার অবশিষ্ট থাকে। চারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে নারিকেলের রশি দিয়ে সিমেন্টের খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গাছ বড় হলে কাণ্ড থেকে শিকড় বের হয়ে খুঁটিকে আকড়ে ধরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। প্রতিটি খুঁটির মাথায় একটি মটর সাইকেলের পুরাতন টায়ার মোটা তারের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে এবং গাছের মাথা ও অন্যান্য ডগা টায়ারের ভিতর দিয়ে বাহিরের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এইরূপ ঝুলন্ত ডগায় ফল ধরার পরিমাণ বেশি হয়।

গাছে সার প্রয়োগ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্খিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরূপ:

গাছের বয়স	মাদাপ্রতি সারের পরিমাণ/বছর			
	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-৩ বছর	৪০-৫০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৬ বছর	৫০-৬০	৩৫০	৩০০	৩০০
৬-৯ বছর	৬০-৭০	৪০০	৩৫০	৩৫০
১০ বছরের উর্দ্ধে	৭০-৮০	৫০০	৫০০	৫০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে ফেব্রুয়ারি, জুন ও অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা দরকার, বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: ড্রাগন ফল গাছ খরার ও জলাবদ্ধতার প্রতি খুব সংবেদনশীল। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মত হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর এক বার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে থাকে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানির কষ্ট/পীড়ন দিলে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে দেখা যায়।

প্রুনিং ও ট্রেনিং: ড্রাগন ফল দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা শাখা (ডগা) তৈরি করে। একটি এক বছরের গাছ ৩০টি পর্যন্ত শাখা তৈরি করতে পারে এবং ৪ বছর বয়সী একটি ড্রাগন ফলের গাছ ১৩০টি পর্যন্ত প্রশাখা তৈরি করতে পারে। তবে শাখা-প্রশাখা উৎপাদন উপযুক্ত ট্রেনিং ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ১২-১৮ মাস পর একটি গাছ ফল ধারণ করে। ফল সংগ্রহের পর ৪০-৫০ টি প্রধান শাখায় প্রত্যেকটিতে ১/২ টি সেকেন্ডারী শাখা অনুমোদন করা হয়। তবে এ ক্ষেতের টারসিয়ারী ও কোয়াটরনারী প্রশাখা কে অনুমোদন করা হয় না। ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর কার্যক্রম দিনের মধ্য ভাগে করা ভালো। ট্রেনিং ও প্রুনিং করার পর অবশ্যই যে কোন ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই আক্রমণ করতে পারে।

ফল সংগ্রহ ও ফলন: গোলাকার থেকে ডিম্বাকার উজ্জ্বল গোলাপী থেকে লাল রঙের ফল। যার ওজন ২০০-৭০০ গ্রাম। এ ফলগুলো ৭-১০ সে.মি. চওড়া এবং ৮-১৪ সে.মি. লম্বা হয়। ভিতরের পাল্প সাদা, লাল, হলুদ ও কালো রঙের হয়। পাল্পের মধ্যে ছোট ছোট কালো নরম অনেক বীজ থাকে। এই বীজগুলো দাঁতের নিচে পড়লে সহজেই গলে যায়। এ ফলগুলো হালকা মিষ্টি। এর মিষ্টতা (টি.এস.এস./ব্রিক্স ১৬-২৪%) ফলগুলো দেখতে ড্রাগনের চোখের মত রঙ ও আকার ধারণ করে। ফলটির সামনের শেষের দিকে হালকা গর্তের মতো থাকে। এ ফলের চামাড়ার উপরে আনারসের মতো স্কেল থাকে। ১২-১৮ বছর বয়সের একটি গাছে ৫-২০টি ফল পাওয়া যায় কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক একটি গাছে ২৫-১০০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা: ড্রাগন ফল নন ক্লাইমেটারিক ফল হওয়ায় সংগ্রহোত্তর ইথিলিন উৎপাদন ও শ্বসনের হার কম থাকে। এই কারণে ফল পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত ফল ও স্পাইনলেটের রঙ লালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ফলে মিষ্টতা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপক্ক ফলের তুলনায় অনেক কম থাকে। ভাল বাজারমূল্য পাওয়ার জন্য ফল লালচে বর্ণ ধারণ করার ৫-৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা ভাল। গাছে ফল অতিরিক্ত পাকিয়ে সংগ্রহ করলে ফলের চাসরা ফেটে যেতে পারে এবং ফলের সংরক্ষণকাল ও স্বাদ কমে যায়। অধিক পরিপক্ক ফল খুব দ্রুত আর্দ্রতা হারায় এবং নষ্ট হতে থাকে।

সবজির জাত

বারি টমেটো ১৬

একটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত। ফল গাঢ় লাল, অনেকটা অর্ধ গোলাকৃতির, তবে ফলে বীজের সংখ্যা অনেক কম। প্রতিটি গাছে গড়ে ৫১-৫৩ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭০-৭৭ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল। ফলন ৭১-৮০ টন/হেক্টর।

বারি টমেটো ১৭

উচ্চ ফলনশীল ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। এ জাতটির আগামক্তের বৈশিষ্ট্য সন্তোষজনক (৪৫-৪৭ দিনে প্রথম ফুল আসে), ফল বড় আকারের লম্বাটে, লাল রঙের, টিএসএস ৪.৪৫%, যুক্ত আট প্রকোষ্ট (locule) বিশিষ্ট ঘন compact মাংশল ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ১৭৭-১৮৭ গ্রাম। প্রতি গাছে ২৩-২৬টি ফল ধরে। গড় ফলন প্রায় ৭১-৭৪ টন/হেক্টর। প্রথম বারের মত বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বড় আকারের ফল বিশিষ্ট ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট এবং হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।

উৎপাদন প্রযুক্তি

চাষাবাদ উপযোগিতা: বাংলাদেশের সব অঞ্চলে শীতকালে চাষ করা যায়।

বপন/রোপণ: অক্টোবর (কার্তিক) মাসে এ বীজ বপন এবং নভেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসে রোপণ করা ভাল।

মাটি ও জলবায়ু: আলো-বাতাসযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ সব মাটিতেই টমেটো ভাল জন্মে। পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। মাটির অম্লতা (pH) ৬-৭ হলে এর আবাদ ভাল হয়। মাটির অম্লতা বেশি হলে জমিতে চুন প্রয়োগ করা উচিত। টমেটো এদেশে শীতকালীন ফসল। তাই উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা টমেটো গাছে রোগ বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ঝরে পড়ে। তাই গ্রীষ্মকালে নির্বাচিত জাত চাষ করতে হবে।

জীবন কাল: চারা রোপণ থেকে ৯০-১০০ দিন।

বীজের হার: ২০০ গ্রাম/হেক্টর।

চারা উৎপাদন: সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ৫০ গ্রাম ভাল বীজ ঘন করে প্রতিটি ৩ মিটার × ১ মিটার বীজতলায় বুনতে হয়। এই হিসেবে প্রতি হেক্টর জমির জন্য ২০০ গ্রাম বীজ বুনতে (গজানোরা হার শতকরা ৮০ ভাগ) ৪টি বীজতলার প্রয়োজন। গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪ সে.মি. × ৪ সে.মি. দূরত্বে স্থানান্তর করতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে টমেটো চাষের জন্য এইরূপ ২২টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। বীজতলায় ৪০-৬০ সে.মি. (প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪০-৬০টি ছিদ্রযুক্ত) নাইলন নেট দিয়ে ঢেকে চারা উৎপাদন করলে চারা অবস্থায়ই সাদা মাছি পোকার দ্বারা পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস রোগ ছড়ানোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন অথবা ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার ৪০ সে.মি. দূরত্বে লাগাতে হবে। বীজতলা থেকে চরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর) ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)	মোট পরিমাণ (শতাংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময়		১ম উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ১০ দিন পর)		২য় উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ২৫ দিন পর)		৩য় উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ৪০ দিন পর)	
			হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	১০ টন	৪০ কেজি	-	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	১২০০ গ্রাম	-	-	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	১০০ কেজি	০.৪ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	-	-	৯০ কেজি	০.৩৫কেজি	৬০ কেজি	০.২৫ কেজি

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর/কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমপি সার জমিতে ভালভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক এমপি সার দুই কিস্তিতে চারা লাগানোর ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ১০,২৫ ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগকৃত ইউরিয়া এবং এমপি সার গাছের গোড়ায় ১০-১৫ সে.মি. দূরে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীকালে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হবে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য পরিমিত নালা (৩০-৪০ সে.মি.) এবং তা এক দিকে মৃদু ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মালচিং: প্রতিটি সেচের পর মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

আগাছা দমন: টমেটোর জমি প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: সময়মত বর্ণিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা: ১ম ফুলের গোছার ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে । গাছে বাঁশের খুটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ): ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে। এতে ফল অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। অপরিপক্ক অবস্থায় ফল সংগ্রহ করে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ফল পাকানো হলে ফলের স্বাভাবিক স্বাদ ও পুষ্টি গুণ ব্যাহত হয় এবং ফলনও কম হয়। তাই এভাবে ফসল সংগ্রহ ও পাকানো মোটেই উচিত নয়।

হাইব্রিড টমেটোর জাত

বারি হাইব্রিড টমেটো ৯

উচ্চ ফলনশীল লাইন দীর্ঘ সময় সংগ্রহযোগ্য (৪৫-৫৫ দিন)। এ লাইনটির আগামত্বের বৈশিষ্ট্য সন্তোষজনক (৪৭-৫০ দিনে প্রথম ফুল আসে), ফল মাঝারী আকারের গোলাকার, লাল রঙের, টিএসএস ৪.২০%, যুক্ত পাঁচ প্রকোষ্ট (locule) বিশিষ্ট মাংশল ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ৯১-৯৬ গ্রাম। প্রতি গাছে ৫১-৫৪টি ফল ধরে। গড় ফলন প্রায় ৭৫-৮০ টন/হেক্টর। জাতটি একটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত। ফল গোলাকার এবং ফলে বীজের সংখ্যা কম। এ জাতটি টমেটো হলুদ পাতা কুকড়ানো ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: টমেটো এদেশে শীতকালীন ফসল তবে কিছু কিছু জাত গ্রীষ্মকালেও চাষ করা যায়। উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় টমেটোর ফুল ঝরে পড়ে। টমেটের ভাল ফলনের জন্য তাপমাত্রা ২০-২৫° সেলসিয়াস উত্তম। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বারি হাইব্রিড টমেটো ৯ শীতকালে চাষ উপযোগী।

বীজ বপনের সময়: শীতকালে অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক)

জমি তৈরি: টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশে জমি তৈরির ওপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থান এবং রোপণকাল ভেদে ২০-৩০ সে.মি. উঁচু এবং ১২০ সে.মি. চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। দু'টি বেডের মাঝে ৫০ সে.মি. চওড়া নালা রাখতে হবে।

বীজ শোধন: কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স দিয়ে টমেটোর বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে বীজবাহিত রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

চারা উৎপাদন: সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ৫০ গ্রাম পরিপক্ক ও রোগমুক্ত বীজ ঘন করে ৩ মিটার × ১ মিটার আকারের বীজতলায় বুনতে হবে। এই হিসেবে প্রতি হেক্টরে ২০০ গ্রাম (১ গ্রাম প্রতি শতাংশ) বীজ বুনতে হয়। গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪×৪ সে.মি. দূরত্বে স্থানান্তর করতে হবে। এক হেক্টর জমিতে টমেটো চাষের জন্য এরূপ ২২টি বীজতলার প্রয়োজন হয়।

সার প্রয়োগ: ভাল ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে সুষম সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সারের মাত্রা জমির উর্বরতার ওপর নির্ভরশীল। মধ্যম উর্বর জমিতে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করা হয়।

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)	মোট পরিমাণ (শতাংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময়		১ম উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ১০ দিন পর)		২য় উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ২৫ দিন পর)		৩য় উপরিপ্রয়োগ (চারা লাগানোর ৪০ দিন পর)	
			হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি
পচা গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	১০ টন	৪০ কেজি	-	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	১২০০ গ্রাম	-	-	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	১০০ কেজি	০.৪ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	১০০ কেজি	০.৪ কেজি	-	-	৯০ কেজি	০.৩৫কেজি	৬০ কেজি	০.২৫ কেজি

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর/কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমপি সার জমিতে ভালভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক এমপি সার দুই কিস্তিতে চারা লাগানোর ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ১০,২৫ ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগকৃত ইউরিয়া এবং এমপি সার গাছের গোড়ায় ১০-১৫ সে.মি. দূরে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ: চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে বীজতলা থেকে উঠিয়ে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সে.মি. এবং সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৪০ সে.মি.। বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম। লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তী সময় প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য ৩০-৪০ সে.মি. চওড়া নালা এবং এক দিকে সামান্য ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিড়ানী দেয়া: প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে

আগাছা দমন: টমেটোর জমি প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা: ১ম পুষ্পমঞ্জরীর ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া নিচের সব পার্শ্বকুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: ফলের নিচের ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই বাজারজাতকরণের জন্য ফল সংগ্রহ করতে হবে। এরুপ ফল সংগ্রহ করলে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ফলন: হেক্টরপ্রতি ৭৫-৮০ টন টমেটো উৎপাদিত হয়।

ঝিঙ্গার জাত

বারি ঝিঙ্গা ২

জাতটি উচ্চ ফলনশীল (১৯-২৯ টন/হেক্টর) এবং রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফলের দৈর্ঘ্য গড়ে ২৭ সে.মি.। প্রতিটি গাছে গড়ে ৪৫টি ফল ধরে। এ ফসলটির ফলের পুষ্টি গুণাগুণ ভালো। ভালভাবে চাষাবাদে বীজ বপনের ৫৫-৬০দিন পর ফসল তোলা যায়। জাতটি ভাইরাসজনিত রোগ সহনশীল।

উৎপাদন প্রযুক্তি

উৎপাদন মৌসুম: এদেশে ঝিঙ্গা প্রধানত খরিফ মৌসুমেই চাষ হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে যে কোন সময় ঝিঙ্গার বীজ বোনা যেতে পারে।

বীজের হার: ঝিঙ্গার জন্য হেক্টরপ্রতি ৫-৬ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও বপন পদ্ধতি

- খরিফ মৌসুমে চাষ হয় বলে ঝিঙ্গার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমার সম্ভাবনা নেই।
- বসতবাড়িতে চাষ করতে হলে দু-চারটি মাদায় বীজ বুনে গাছ বেয়ে উঠতে পারে এমন ব্যবস্থা করলেই হয়।
- বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে শিকড় সহজেই ছড়াতে পারে। জমি বড় হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।
- বেডের প্রস্থ হবে ১.০ মিটার এবং দু-বেডের মাঝে ৩০ সে.মি. নালা থাকবে।
- ঝিঙ্গার বীজ সরাসরি মাদায় বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন করতে হবে।
- তাছাড়া পলিব্যাগে (১০ × ১২ সে.মি.) ১৫-২০ দিন বয়সের চারা উৎপাদন করে নেওয়া যেতে পারে।
- ঝিঙ্গার জন্য ১.৫ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হবে।
- চারা গজানোর পর একের অধিক গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে।
- বীজের ত্বক শক্ত ও পুরু বিধায় বোনার পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজেয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়।

❀ মাদায় বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত ১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে তৈরি করে নিতে হবে। মাদার আয়তন হবে ৪০ × ৪০ × ৪০ সে.মি.।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ঝিঙ্গার জমিতে নিম্ন বর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)	মোট পরিমাণ (শতাংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময় (শতাংশ প্রতি)	মাদা প্রতি				
				চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	২০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	২০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	-	৮ গ্রাম	-	-	-	-

বি.দ্র. মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে 'জো' এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

❀ সময়মত নিড়ানী দিয়ে আগাছা সবসময় পরিষ্কার করে সাথে সাথে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

❀ খরা হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। পানির অভাব হলে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় এর লক্ষণ প্রকাশ পায় যেমন প্রাথমিক অবস্থায় চারার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরবর্তীকালে ফুল ঝরে যাওয়া, ফলের বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া ও ঝরে যাওয়া ইত্যাদি।

❀ ঝিঙ্গার বীজ উৎপাদনের সময় খেয়াল রাখতে হবে ফল পরিপক্ক হওয়া শুরু হলে সেচ দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

❀ বাউনী দেয়া ঝিঙ্গার প্রধান পরিচর্যা। চারা ২০-২৫ সে.মি. উঁচু হতেই ১.০-১.৫ মিটার উঁচু মাচা তৈরি করতে হবে এবং বাউনীর ব্যবস্থা করতে হবে। বাউনী দিলে ফলন বেশি ও ফলে গুণগত মান ভালো হয়।

❀ গাছের গোড়া থেকে ডালপালা বের হলে সেগুলো কেটে দিতে হয় এতে গোড়া পরিষ্কার থাকে, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উৎপাত কম হয়।

❀ জুন-জুলাই মাস থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আর সেচের প্রয়োজন হয় না। জমির পানি নিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বেড ও নিকাশ নালা সর্বদা পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

- চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর ঝিঙ্গার গাছ ফল দিতে থাকে। স্ত্রী ফুলের পরাগায়ণের ১০-১৩ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। কচি ও খাওয়ার উপযোগী পুষ্ট অবস্থায় ২-৩ দিন পর ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুই আড়াই মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।
- উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ঝিঙ্গার হেক্টরপ্রতি ফলন ২৩-২৪ টন পাওয়া যায়।

ব্রোকলির জাত

ব্রোকলি সরিষা (Brassicaceae) পরিবারের একটি কপি গোত্রভুক্ত সবজি। এটি উদ্ভিদতাত্ত্বিক দিক থেকে ফুলকপির খুব কাছাকাছি ও বর্ষজীবি ফসল। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica oleracea var. italica.*। পুষ্পমঞ্জুরীর বর্ণ মখমলীয় সবুজ এবং প্রাথমিক অবস্থায় বোঁটা মোটা ও মাংসল থাকে এবং এর শাখামঞ্জুরীও ভক্ষণযোগ্য যা মাসাধিক কাল ধরে সংগ্রহ করা যায়। ফসল রোপণ থেকে বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত প্রায় ১৩৫-১৪০ দিন সময় লাগে।

বারি ব্রোকলি-১

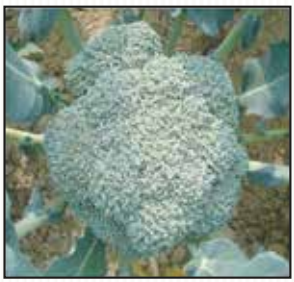

উচ্চ ফলনশীল জাত। গড়ে প্রতিটি বিক্রয়োপযোগী পুষ্পমঞ্জুরীর ওজন ৪৫০ গ্রাম, ব্যাস ১২.৫০ সে.মি. ও লম্বায় ১৩.৯৩ সে.মি.। প্রতি হেক্টরে গড় ফলন প্রায় ১২ টন। গাছ ঊর্দ্ধমুখী, পাতা সুস্পষ্ট খাঁজ বিশিষ্ট ও মখমল সবুজ বর্ণের। চারা রোপণের ৫৩ দিনের মাথায় পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়া শুরু হয় যা ১৫ দিনের মাথায় খাদ্যোপযোগী হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মুক্ত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন সম্ভব (প্রতি হেক্টরে প্রায় ৬৩০ কেজি)।

মাটি ও আবহাওয়া: ব্রোকলির পরিবেশিক উপযোগিতার সীমা ফুলকপির চেয়ে একটু আলাদা। ব্রোকলির গাছ ১৫ - ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভালো জন্মে। সাধারনত মাঝ সেপ্টেম্বর থেকে মাঝ অক্টোবর এর বীজ বপনের সময় যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে ফলন দেয়। মাঝারী থেকে উচ্চমানের বেলে দো-আঁশ মাটি ব্রোকলি চাষের জন্য সর্বোত্তম। যে কোন স্থানে সব ধরনের মাটিতেই এর চাষ করা সম্ভব হলেও দাঁড়ানো পানিতে এরা বেঁচে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের হিল ভ্যালিতে এর সফল চাষাবাদ সম্ভব।

উৎপাদন মৌসুম: এটি শীতকালীন ফসল।

বীজের হার ও চারা উৎপাদন: চারা তৈরির জন্য ৩ x ১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে ব্রোকলি চাষের জন্য ৩০০-৩৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। ব্রোকলি চাষের জন্য ৩০ দিন বয়সের চারা লাগাতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সে.মি. এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সে.মি. হবে।

বপনের সময়: ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর) মাসে বীজ বপন করতে হয় এবং কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত (মধ্য-নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর) জমিতে চারা রোপণ করা যায়।

সারের পরিমাণ: ব্রোকলি চাষের জন্য মাঝারী উর্বর জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ব্রোকলি চাষে হেক্টর প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (কেজি/হেক্টর) মাটির অম্লক্ষারকত্ব (pH) ৫.৫ এর নিচে হলে ১০০ কেজি চুন প্রয়োগ করলে ভাল ফল দেখা দেয়।

সারের নাম	মোট পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	শেষ চাষের সময়	চারা রোপণের পূর্বে	চারা রোপণের ১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩৫ দিন পর
গোবর	১৫ হাজার কেজি	অর্ধেক ৭৫০০ কেজি	অর্ধেক ৭৫০০ কেজি	-	-
ইউরিয়া	২৫০ কেজি	-	-	১২৫ কেজি	১২৫ কেজি
এমপি	২০০ কেজি	-	-	১০০ কেজি	১০০ কেজি
টিএসপি	১৫০ কেজি	-	১৫০ কেজি	-	-
পচা খৈল	প্রতি চারায় ৫০ গ্রাম	-	প্রতি পিটে দিতে হবে	-	-
বরিক এসিড	১২ কেজি	সম্পূর্ণ পরিমাণ	-	-	-
মলিবডেনাম	১ কেজি	সম্পূর্ণ পরিমাণ	-	-	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর, সমুদয় টিএসপি ও অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর চারা রোপণের ১ সপ্তাহ পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হয়। ইউরিয়া ও বাকি অর্ধেক এমওপি সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং চারা রোপণের ৩০-৫০ দিন পর বাকি সার ২ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ফলন: ১২-১৫ টন/হেক্টর।

কামরাঙ্গা শিমের জাত

বারি কামরাঙ্গা শিম-১

কামরাঙ্গা শিম বা চারকোনা শিমের জাতটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উন্নতমানের আমিষসমৃদ্ধ একটি সবজি। এর পাতা শাক হিসেবে, শিম সবজি, বীজ ডাল এবং কন্দমুল আলুর মত খাওয়া যায়। এটি উচ্চ ফলনশীল (গড়ে ২০.০৭ টন/হেক্টর) এবং পোকামাকড় প্রতিরোধী। এর শিম আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের, গড়ে ১৭.৮ সে.মি. লম্বা, ২.৬৫ সে.মি. চওড়া, লম্বা প্রতিটি শিমের গড় ওজন ১৫.২ গ্রাম।

কামরাঙ্গা শিমের প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী বিভিন্ন অংশের পুষ্টি উপাদান নিম্নরূপ:

সারণী ১: কামরাঙ্গা শিমের প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী বিভিন্ন অংশের পুষ্টি উপাদান

উপাদান	একক	পাতা	কচি শিম	পাকা বীজ	কন্দমূল
পানি	গ্রাম	৬৪-৮৫	৭৬-৯৩	৯-২৪	৫৫-৬৫
আমিষ	"	৫.০-৭.৬	১.৯-৪.৩	৩০-৩৯	৩-১৫
শ্বেতসার	"	৩.০-৮.৫	১.১-৭.৯	২৪-৪২	২৭-৩০
আঁশ	"	৩.০-৪.২	০.৯-৩.১	৩.৭-১৬	১.৬-১.৭
ছে	"	০.৫-২.৫	০.১-৩.৪	১৫-২০.৪	০.৪-১.১
তাপশক্তি	কিলো ক্যালোরি	৫০	৪৫	৪১৮	১৫০
ক্যারেটিন	আ. ইউ.	১০০০০	৫৯৫	৩৩০	--

এ ছাড়াও এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও লৌহ রয়েছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: কামরাঙ্গা শিমের গাছের বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ ভাল। ফুল ধারণের জন্য খাট দিবস (১২ ঘণ্টার কম) এবং মধ্যম তাপমাত্রা (১৮০- ৩২০ সে.) প্রয়োজন। সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ মাটিতে (পি.এইচ মান ৫.৫-৮.০) এ শিম ভাল জন্মে। মার্চ মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বীজ বোনা যায়। তবে শ্রাবণ (মধ্য জুলাই-মধ্য আগস্ট) মাসে এক মিটার দূরে সারিতে ৩০ সে.মি. দূরে দূরে বীজ বপন করলে সবচেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়। উদ্ভাবিত জাতটি

উচ্চফলনশীল, পোকামাকড় ও রোগবালাই সহনশীল। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য এ জাতটি উপযোগী।

উৎপাদন মৌসুম: এটি শীতকালীন ফসল।

বপনের সময়: আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বীজ বপন করতে হয়।

বীজের হার: ৫-৬ কেজি/হেক্টর

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	১০০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এমওপি	১৫০ কেজি

ফলন: ২০-২১ টন/হেক্টর

শিমের জাত

বারি শিম-৮

বারি শিম-৮ একটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত, সারা দেশে চাষ উপযোগী। এটি অন্যান্য চাষযোগ্য শিমের তুলনায় ২০-৩০ দিন আগে সংগ্রহ করা যায়। শিম নরম, মাংসল ও আঁশ কম। শিম সবুজ লম্বা, কিছুটা বাকানো। বীজ আকারে বড়। হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন ২২.৫ টন/হেক্টর। পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: এ সবজির অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। সাধারণত ছোট দিবস এবং শীত না পড়লে শিমের পুষ্পায়ন ঘটে না। বারি শিম-৮ সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। তবে সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত।

বীজ বপনের সময়: মধ্য আগস্ট-মধ্য সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝী পর্যন্ত বীজ বপন করা যেতে পারে।

বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ১২-১৫ কেজি বীজ লাগে।

জমি তৈরি: জমি ৪-৫টি চাষ দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে পরিপাটি করে তৈরি করতে হবে। এরপর সমতল জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে উঁচু মাদা তৈরি করে বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধার জন্য বেড ১৫-২৫ সে.মি. উঁচু এবং ২.৫ মিটার প্রশস্ত হবে। বেড প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বা করা যেতে পারে। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝখানে ৫০ সে.মি. প্রশস্ত এবং ১৫-২৫ সে.মি. গভীর নালা রাখতে হবে। বেডের লাইনে ১.৫০ সে.মি. দূরে দূরে মাদা তৈরি করে বীজ বপন/চারা রোপণ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: শিম ডাল জাতীয় শস্য। এতে সারের পরিমাণ বিশেষ করে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ কম লাগে। নিম্নে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি দেখানো হল।

সারের পরিমাণ ও পদ্ধতি

সার	মোট সারের পরিমাণ		শেষ চাষের সময় প্রয়োগ		বপনের/রোপণের পূর্বে মাদায় প্রয়োগ		বপনের/রোপণের ২৫-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	সব	সব	-	-	-	-
ইউরিয়া	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	-	-	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম
টিএসপি	৯০ কেজি	৩৫০ গ্রাম	-	-	সব	সব	-	-
এমপি	৬০ কেজি	২৫০ গ্রাম	-	-	৩০ কেজি	১২৫ গ্রাম	৩০ কেজি	১২৫ গ্রাম
জিপসাম	৫ কেজি	২০ গ্রাম	সব	সব	-	-	-	-
বোরিক এসিড	৫ কেজি	২০ গ্রাম	সব	সব	-	-	-	-

বীজ বপন বা চারা রোপণ: সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৪-৫ দিন পর মাদার বীজ বপন বা চারা রোপণ করা যেতে পারে। বীজ সরাসরি মাদায় বপন করা হয়। তবে পলি ব্যাগে চারা তৈরি করেও মাদায় চারা রোপণ করা যেতে পারে। পলিব্যাগে চারা তৈরি করলে ১০-১৫ দিন বয়সের চারা (২-৩ পাতাযুক্ত) রোপণ করা উত্তম।

পরবর্তী পরিচর্যা: বপনকৃত বীজ থেকে চারা বের হওয়ার ৮-১০ দিনের মধ্যেই প্রতিটি মাদায় একটি করে সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। ফসলের জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছ ২৫-৩০ সে.মি. উঁচু

হলেই খুঁটি দিতে হবে। মাটির রস যাচাই করে ১০-১২ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। পুরাতন পাতা ও ফুলবিহীন ডগা/শাখা কেটে ফেলতে হবে

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর থেকে শিম উঠানো যেতে পারে ।

ফলন: হেক্টরপ্রতি প্রায় ২২-২৩ টন শিম পাওয়া যায়।

পালংশাকের জাত

বারি পালংশাক ১

জাতটি উচ্চ ফলনশীল (গড়ে ৪৯ টন/হেক্টর) এবং পোকামাকড় প্রতিরোধী। এর পাতা আকারে বড়, বোঁটা ছোট, পাতা আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের, পাতা নরম, খেতে সুস্বাদু এবং শাকটির পুষ্টি গুণাগুণও অত্যন্ত উচ্চমানের। পাতা ও কাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ক্যারোটিন রয়েছে। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর থেকে সংগ্রহ করা যায়। ফুল দেরিতে আসে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: পালংশাক একটি কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য ১৫-২৫° সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। এ উদ্ভিদ দ্বি-বর্ষ জীবি, শীতের আবেশ না পেলে ফুল ধারণ করে না। তবে উচ্চ তাপমাত্রায় জন্মানো শাক স্বাদে ভাল হয় না। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটিতে পালং শাক ভালো জন্মে । খরিফের শেষ ভাগ থেকে পুরো রবি মৌসুমব্যাপী জন্মানো যায়। আগাম হিসেবে আগস্ট মাস থেকে বোনা যেতে পারে। তবে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে বপন করলেও ভাল হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে সুপরিশকৃত পালংশাকের কোন জাত নেই। স্থানীয় জাতসমূহে দেখা যায় যে, প্রচুর সংখ্যক পাতা উৎপাদন না করেই ফুল ধারণ করে, এতে ফলন কমে যায়। তাই এই জাতটি বাংলাদেশর সর্বত্র চাষের জন্য উপযোগী।

উৎপাদন মৌসুম: এটি শীতকালীন ফসল।

বপনের সময়: অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ বপন করতে হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (হেক্টর ও শতাংশপ্রতি)

সার	মোট সারের পরিমাণ		জমি তৈরির সময় + গর্তে প্রয়োগ		চারা রোপণের ১০ দিন পর		চারা রোপণের ৩০ দিন পর		চারা রোপণের ৪৫ দিন পর	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	৫+৫ টন	২০+২০ কেজি	-	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৮০ কেজি	৭০০ গ্রাম	৭৫ কেজি	২৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
এমপি	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	৫০ কেজি	২০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম

ফলন: ৪৫-৫০ টন/হেক্টর

চিনালের জাত

বারি চিনাল-১

উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল বড় (১৩৪০ গ্রাম), ফল দেখতে গোলাকার ও আকর্ষণীয়, সোনালী হলুদ রঙের। স্বাদ হালকা মিষ্টি (টিএসএস (৬.৬৭%), সুগন্ধিযুক্ত ও আঁশবিহীন। বীজ ছোট, খোসা পাতলা, খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৮৫%। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৫ - ৬টি এবং গড় ফলন প্রায় ১৯ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: চিনাল (হানিডিউ) গ্রীষ্ম ও অবগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফসল। এর জন্য মাঝারী বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট দীর্ঘ, উষ্ণ গ্রীষ্মকাল প্রয়োজন। এ গাছ তাপ সহিষ্ণু, যে কোন স্থানে সব ধরনের মাটিতেই এর চাষ করা সম্ভব তবে দাঁড়ানো পানিতে এরা বেঁচে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাসমূহে এ গাছ বেশি চোখে পড়ে। সারা বছর গাছে ফুল আসে এবং ৭০-৮০ দিন পর ফল পাকে।

উৎপাদন মৌসুম: রবি ও খরিফ দুই মৌসুমেই চাষাবাদ করা যায়।

বপনের সময়: সারা বছর চাষ উপযোগী।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	১০ টন
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি
এমওপি	১৫০ কেজি

ফলন: ২০-২২ টন/হেক্টর।

পোকামাকড় ও রোগবালাই

জাতটিতে সাধারণ রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম। তবে পাতায় অ্যানথ্রাকনোজ এর কিছু আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় যা প্রোভেক্স (@ ৩ গ্রাম/কেজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন বা ব্যাভিস্টিন (০.২%) নামক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে দমন করা যায়। পাকা ফলে কখনও কখনও মাছি পোকার আক্রমণ দেখা যায় যা ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে সহজেই দমন করা সম্ভব। এছাড়া বন্য সজারু ও শিয়াল কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করে যা জাল দিয়ে ঢেকে বা টিন পিটিয়ে রোধ করা যায়।

হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়ার জাত

বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-১

উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারী আকারের (১.৫ কেজি) ফল দেখতে গোলাকার ও চ্যাপ্টা। ফল কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ আকর্ষণীয়, পাকা অবস্থায় সোনালী হলুদ বর্ণের। স্বাদ মিষ্টি টিএসএস (১০%)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৮টি এবং গড় ফলন প্রায় ৪০ টন/হেক্টর, বারি মিষ্টিকুমড়া-১ এর চেয়ে প্রায় ১.৫ গুণ বেশি।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সুনিষ্কাশিত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ (৫.৫-৬.৮ অম্লতাযুক্ত) দো-আঁশ মাটি উত্তম।

বীজ বপনের সময় ও বীজের হার: শীতকালীন ফসলের জন্য অক্টোবর-নভেম্বর এবং গ্রীষ্মকালীন ফসলের জন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। বীজের হার বিঘাপ্রতি ৬৫০-৮০০ গ্রাম এবং হেক্টরপ্রতি ৫-৬ কেজি।

চারা তৈরি ও রোপণ: নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা তৈরি করে রোপণ করা উত্তম। মাঠে ১৬-২০ দিনের চারা লাগাতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে ১৫-২০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে বীজের অঙ্কুরোদগম সহজ ও দ্রুত হবে।

জমি নির্বাচন: একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ পরিহার করতে পারলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কমানো যাবে। এদের শিকড়ের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য জমি এবং গর্ত উত্তমরুপে তৈরি করতে হবে।

বেড ও গর্ত তৈরি এবং চারা রোপণ পদ্ধতি: ১৫-২০ সে.মি. উঁচু, ২.৫ সে.মি. চওড়া এবং লম্বায় সুবিধাজনক এমন বেড তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার হবে ৫০ x ৪৫ সে.মি.। গর্তগুলোর ২ মিটার দূরে দূরে এক সারিতে হবে। গর্তের কেন্দ্র বেডের নিজের দিকের সেচ নালার কিনারা থেকে ৫৫ সে.মি. ভিতরের দিকে এবং বেডের শুরু থেকে ১ মিটার দূরে হবে। দুটো বেডের মাঝখানে পর্যায়ক্রমে ৬০ সে.মি. এবং ৩০ সে.মি. নিকাশ নালা হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: মিষ্টি কুমড়া দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং অনেক লম্বা সময়ব্যাপী ফল দিয়ে থাকে। কাজেই এসব ফসলের সফল চাষ করতে হলে গাছের জন্য পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। খাবার সংগ্রহের জন্য শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলের জন্য মাটি পরীক্ষা সাপেক্ষে সারের মাত্রা সুপারিশ করা হয় নাই। কাজেই যে সব অঞ্চলের জন্য সারের মাত্রা নির্দিষ্ট নেই সেসব অঞ্চলের জন্য পরীক্ষামূলক প্রমাণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত হারে সারের মাত্রা সুপারিশ করা হলো।

মিষ্টি কুমড়ায় সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)	মোট পরিমাণ (শতাংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময় (শতাংশ প্রতি)	মাদা প্রতি				
				চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	২০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম	২৫ গ্রাম
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	২০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	-	৮ গ্রাম	-	-	-	-

বি. দ্র. মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে 'জো' এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

সেচ: মিষ্টিকুমড়া পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। বিশেষ করে ফল ধরার সময় প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে শতকরা ৯০ ভাগ ফল ঝরে যেতে পারে। কাজেই প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। মিষ্টি কুমড়ার জমিতে প্লাবন সেচ না দিয়ে শুধু সেচ নালায় পানি দেয়া উত্তম।

শোষক শাখা অপসারণ: মিষ্টি কুমড়ার গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট ডালপালাগুলোকে শোষক শাখা বলা হয়। এগুলোকে গাছের গোড়ার দিক থেকে ৩৫-৪০ সে.মি. পর্যন্ত ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ণ: কৃত্রিম পরাগায়ণের মাধ্যমে মিষ্টি কুমড়ার ফলন শতকরা ২৫-৩০ ভাগ বাড়ানো যায়। এর ফুল খুব সকালে ফোটে। এক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়ণ সকাল ৯.০০ ঘটিকার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

মিষ্টিকুমড়ার কাঁচা ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা: কাঁচা ফল পরাগায়ণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। ফলে সবুজ রঙ থাকবে এবং ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে। নখ দিয়ে ফলের গায়ে চাপ দিলে নখ সহজেই ভেতরে ঢুকে যাবে।

পাকা ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করে মিষ্টিকুমড়ার পূর্ণ পরিপক্কতা নির্ধারণ করা হয়। ফলের বোঁটা খড়ের রঙ ধারণ করবে। ফলের রঙ হলুদ অথবা হলুদ-কমলা রঙ ধারণ করবে।

পাকা ফল সংগ্রহকালে বিশেষ সতর্কতা

ফল সংগ্রহের ২/৩ সপ্তাহ পূর্বে সেচ দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এতে ফলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পাবে।

ফলন: ৩৮-৪২ টন/হেক্টর।

মিষ্টি মরিচের জাত

বারি মিষ্টি মরিচ-২

সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি থেকে AVRDC এর কয়েকটি লাইন সংগ্রহ করে। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১১ সালে বারি মিষ্টি মরিচ ১ জাতটি মুক্তায়িত হয় এবং অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ বছর ২০১৫ সালে বারি মিষ্টি মরিচ ২ (BARI Misti Morich 2) জাতটি মুক্তায়িত হয়েছে।

এটি ৮০-৯০ গ্রাম ওজনের বড় আকর্ষণীয় Bell shaped ফল। চকচকে সবুজ ফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। অন্যদিকে আমাদের দেশে আবাদকৃত জাতগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে– California Wonder, Tender Bell (F_1) এবং Yolo Wonder ইত্যাদি। প্রতি বৎসর এগুলোর বীজ আমদানী করতে হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: মানসম্মত ক্যাপসিকাম উৎপাদনের জন্য ১৬ - ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৬-২১° সেলসিয়াস এর কম বা বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফুল ঝরে পড়ে, ফলন ও মান কমে যায় কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয় না। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে নভেম্বরে চারা রোপণ করলে দেখা যায় যে, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারি পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারণে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এজন্য গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনি, পলি হাউস, পলিভিনাইল হাউসে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে। সুনিষ্কাসিত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি মিষ্টি মরিচ চাষের জন্য উওম। মিষ্টি মরিচ খরা এবং জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারেনা। মিষ্টি মরিচের জন্য মাটির অম্লক্ষারত্ব ৫.৫-৭.০ এর মধ্যে হওয়া বাঞ্চনীয়।

জীবন কাল : জাত ও মৌসুম ভেদে মিষ্টি মরিচের জীবন কাল ১৩০ থেকে ১৫০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বীজ বপনের সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস।

বীজের মাত্রা : প্রায় ১৪০টি বীজ প্রতি এক গ্রাম বীজে থাকে। অঙ্কুরোদগমের হার ৯০% এবং প্রতিষ্ঠার/বাঁচার হার ৯০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টরে বীজের পরিমাণ ২৩০ গ্রাম এবং চারার সংখ্যা ৩০,০০০ প্রয়োজন ।

চারা উৎপাদন: প্রথমে বীজগুলো ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সুনিষ্কাসিত উঁচু বীজ তলায় মাটি মিহি করে ১০ × ২ সে.মি. দূরে দূরে বীজ বপন করে হালকাভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনানুসারে ঝাঝারি দিয়ে হালকা ভাবে সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ৭-১০দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে ৯×১২ সে.মি. আকারের পলি ব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। পটিং মিডিয়াতে ৩:১:১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি, কম্পোস্ট এবং বালি মিশাতে হবে। পরে পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, যাতে প্রখর সূর্যালোকে এবং ঝড় বৃষ্টি আঘাত হানতে না পারে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: চারার রোপণ দূরত্ব জাত ভেদে ভিন্ন হয়। সাধারণত ৩০ দিন বয়সের চারা ৪৫×৪৫ সে.মি. দূরত্বে রোপণ করা হয়। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বেড প্রস্থে ৭৫ সে.মি. হতে হবে এবং লম্বায় দুটি সারিতে ২০ টি চারা সংকোলনের জন্য ৯ মিটার বেড হবে। দুটি সারির মাঝখানে ৩০ সে.মি. ড্রেন করতে হবে। চারা বিকেল বেলা রোপণ করা উত্তম। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা অনেক কমে যায় এ সময় গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । কাজেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নাইলন নেট এবং পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ক্যাপসিকাম চাষে হেক্টরপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার	মোট পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি/হেক্টর)	পিটে বা গর্তে (কেজি/হেক্টর)	উপরি প্রয়োগ	
				চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	৫০০০	৫০০০	-	-
ইউরিয়া	২৫০	-	৮৪	৮৪	৮৪
টিএসপি	৩৫০	৩৫০	-	-	-
এমপি	২৫০	-	৮৪	৮৪	৮৪
জিপসাম	১১০	১১০	-	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	৫	৫	-	-	-

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর, টিএসপি, জিংক অক্সাইড, জিপসাম এবং ১/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং এমপি পরবর্তীতে দুই ভাগ করে চারা লাগানোর ২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: মিষ্টি মরিচ খরা ও জলাবদ্ধাতা কোনটিই সহ্য করতে পারেনা। জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।

খুঁটি: কোন কোন জাতে ফল ধরা অবস্থায় খুঁটি দিতে হয় যাতে গাছ ফলের ভারে হেলে না পড়ে।

আগাছা দমন: আগাছানাশক বা হাত দিয়ে অথবা নিড়ানী দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হবে।

ফসল তোলা: মিষ্টি মরিচের সাধারনত পরিপক্ক সবুজ অবস্থায় লালচে হলদে হওয়ার পূর্বেই মাঠ থেকে উঠানো হয়। সাধারনত সপ্তাহে একবার গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের পর ঠান্ডা অথচ ছায়া যুক্ত স্থানে বাজার জাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ফসল সংগ্রহের সময় প্রতিটি ফলে সামান্য পরিমাণে বোঁটা রেখে দিতে হবে।

ফলন: উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদ করলে বারি মিষ্টি মরিচ ২ জাতে ২৫-৩০ টন হেক্টরপ্রতি ফলন পাওয়া সম্ভব।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

জাব পোকা (এফিড)

ক্ষতির লক্ষণ: প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক জাব পোকা দলবদ্ধ ভাবে গাছের পাতার রস চুষে খেয়ে থাকে। ফলে পাতা বিকৃত হয়ে যায়, বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও প্রায়শ নিচের দিকে কোকড়ানো দেখা যায়। জাব পোকার শরীরের পিছন দিকে অবস্থিত দুটি নল দিয়ে মধুর মত এক প্রকার রস নি:সরণ করে। এই রস পাতা ও কাণ্ডে আটকে গেলে তাতে সুটি মোল্ড নামক এক প্রকার কালো রঙের ছত্রাক জন্মায় এবং তার ফলে গাছের সবুজ অংশ ঢেকে যায় এবং সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। মেঘলা, কুয়াশাচ্ছন্ন এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় এদের বংশ বৃদ্ধি বেশি হয়। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলে এদের সংখ্যা কমে যায়।

দমন ব্যবস্থা: প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাব পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যায়। নিম বীজের দ্রবণ (১ কেজী পরিমাণ অর্ধভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে) বা সাবান গুলা পানি (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২ চা চামচ গুড়া সাবান মেশাতে হবে) স্প্রে করেও এ পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়। সুতরাং উপরোক্ত বন্ধু পোকাসমূহ সংরক্ষণ করলে এ পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কম হয় যেমন-লেডী বার্ড বিটল, সিরফিড ফ্লাই ইত্যাদি। স্বল্পমেয়াদী বিষক্রিয়া সম্পন্ন কীটনাশক, যেমন- ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. হারে অথবা পিরিমর ৫০ ডিপি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

থ্রিপস পোকা

ক্ষতির লক্ষণ: পূর্ণাঙ্গ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক থ্রিপস পাতা থেকে রস চুষে খায়। পাতার মধ্যশিরার নিকটবর্তী এলাকা বাদামী রঙ ধারণ করে ও শুকিয়ে যায়। নৌকার খোলের ন্যায় পাতা উপরের দিকে কুঁকড়িয়ে যায়। গাঢ় বাদামী রঙের

পূর্নাঙ্গ থ্রিপস পোকা খুবই ছোট, সরু ও লম্বাকৃতির। খালি চোখে কোনমতে এদের দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা: পাঁচ গ্রাম পরিমাণ গুড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা। ক্ষেতে সাদা রঙের ৩০ সে.মি. ৩০ সে.মি. আকারের বোর্ডে পাতলা করে গ্রীজ বা আঠা লাগিয়ে কাঠির সাহায্যে ৩ মিটার দূরে দূরে আঠা ফাঁদ পেতে থ্রিপস পোকা আকৃষ্ট করে মারা। এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করা। আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২মি.লি. পরিমাণ) স্প্রে করা।

লাল মাকড় (মাইট)

ক্ষতির লক্ষণ: লাল মাকড় খাওয়া পাতায় হলুদাভ ছোপ ছোপ দাগের সৃষ্টি হয়। যখন এই ধরনের আক্রমণ পাতার নিচে দিকে মাঝখানে বেশি হয় তখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাতা কুকড়ীয়ে যেতে দেখা যায়। ব্যাপক আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ পাতা হলুদ ও বাদামী রঙ ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত পাতা ঝরে পড়ে। লাল মাকড় পাতার নিচের পৃষ্ঠ-দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে যা খালি চোখে দেখা যায় না। এই ডিম থেকে কমলা রঙের বাচ্চা বের হয়ে বেগুন পাতার নিচের পৃষ্ঠদেশে খেতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চাগুলো গাঢ়-কমলা বা লাল রঙের পূর্ণ মাকড়ে পরিনত হয় যারা দেখতে ক্ষুদ্র মাকড়সার মত। এদের পাতার নিচের পৃষ্ঠদেশে চলাফেরা করতে দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা: নিমতেল ৫ মি.লি. + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা। এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা। আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি হলে নিউরণ ৫০০ ইসি অথবা টর্ক ৫৫০ এস সি ২ মি.লি. হারে প্রতি লিটার পানির সাথে স্প্রে করা যেতে পারে। মাকড়নাশক ওমাইট বা টলস্টার (প্রতি লিটার পানিতে ২মি. লি. পরিমাণ) স্প্রে করা।

রোগবালাই ও দমন

মিষ্টিমরিচের প্রধান রোগবালাই এর মধ্যে এ্যানথ্রাকনোজ, ব্লাইট এবং উইল্টিং অন্যতম। এক্ষেত্রে ব্যাভিস্টিন ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে গুলে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। রোগমুক্ত ভাল বীজ ব্যবহার করতে হবে। ফল পুরোপুরি না পাকিয়ে তুলে নিতে হবে। ক্যাপসিকামের বীজগুলো অবশ্যই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে বীজ রোগমুক্ত রাখতে হবে।

হাইব্রিড পটলের জাত

পটল বাংলাদেশের একটি প্রধান সবজি, যা গ্রীষ্মকালীন সবজি চাহিদার অনেকখানি পূরণ করে থাকে। পটলের উৎপত্তিস্থল ভারত উপমহাদেশে এবং বহুকাল থেকে এ অঞ্চলে পটলের চাষ হয়ে আসছে। বাংলাদেশে যে সব এলাকায় পটল বেশি চাষ হয় তারমধ্যে বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, যশোহর ও কুষ্টিয়া জেলা উল্লেখযোগ্য। পটল একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল, মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উৎপাদন করা যায়। ফলে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সবজি সরবরাহে পটল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পটল ভিটামিন এ, সি এবং খনিজ পদার্থের একটি ভাল উৎস।

বারি হাইব্রিড পটল ১

উচ্চ ফলনশীল। ফলের রঙ গাঢ় সবুজাভ, সাদা ডোরা আছে। ফলের দৈর্ঘ্য ১৩.০১ সে.মি. । প্রতিটি ফলের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১১২.১৬।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: সাধারণভাবে পটল উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর একটি সবজি ফসল। বেশি তাপমাত্রা এবং প্রখর রোগ এর আবাদের জন্য উপযোগী। তবে, বেশি বৃষ্টি হলে এর পরাগায়ণ কমে যায় ও ফলন হ্রাস পায়। পলি, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ মাটি পটল চাষের জন্য ভাল। যে সব জমিতে পানি জমে না তেমন উঁচু জমিতে পটল চাষ করলে বেশি ফলন হয় এবং একাধিক বছর ফসল উৎপাদন করা যায়।

চাষের সময়: অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত যে কোন সময় জমিতে পটল লাগালে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে লাগালে পটলের গাছ ভাল হয় না। ফলে এ সময় পটলের শাখা-কলম (কাটিং) না লাগানো ভাল। সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে লাগালে গাছ থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে লাগালে মে-জুন মাসে ফল ধরে। পটল আলোকসংবেদী না হওয়ায় কয়েক দফায় শাখা-কলম লাগানো যায় এবং গাছ থেকে সারা বছর ফলন পাওয়া যায়।

চারা উৎপাদন: বীজ, শাখা-কলম এবং কন্দমূল (শিকড়) সব পদ্ধতিতেই পটলের বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বাণিজ্যিক চাষের জন্য কাণ্ডের শাখা-কলম ও কন্দমূল ব্যবহার করা ভাল এবং লাভজনক। বীজ তলায় কিংবা সরাসরি জমিতে শাখা-কলম বা কন্দমূল লাগিয়ে চারা উৎপাদ করা যায়। সাধারণত পটলচাষীগণ পুরো কন্দমূল মাদায় রোপণ করেন। কন্দমূল ২-৩টি চোখসহ কেটে মাদায় লাগালে কম কন্দমূল দিয়ে বেশি জমিতে পটল চাষ করা যায়।

রিং পদ্ধতিতে উন্নত শাখা কলম উৎপাদন: ভালো এক বৎসর বয়সী গাছের যে কোন শাখার মাঝামাঝী অংশ থেকে এক মিটার বা দু'হাত লম্বা শাখা দিয়ে রিং বা চুড়ি আকার তৈরি করে পিট বা মাদায় লাগাতে হবে। পটলের শাখা কলম ৫০ পিপিএম ইনডোল বিউটারিক এসিড IBA দ্রবণে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে মাদায় বা পিটো লাগালে তাড়াতাড়ি এবং বেশি সংখ্যক মূল গজায়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: জমিতে 'জো' এলে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। বেড পদ্ধতিতে পটল চাষ করলে ফলন ভাল হয় এবং বর্ষাকালে ক্ষেত নষ্ট হয় না। সাধারণত একা একটি বেড ১.২৫ মিটার বা আড়াই হাত চওড়া হয়। বেডের মাঝামাঝী এক মিটার বা দু'হাত পর পর মাদায় চারা রোপণ করতে হয়। এক বেড থেকে আর এক বেডের মাঝে ৭৫ সে.মি. (প্রায় দেড় হাত) নালা রাখতে হবে। সুষ্ঠু পরাগায়ণের জন্য জমিতে অবশ্যই মোট গাছের ১০ ভাগ পুরুষ গাছ জমির সব অংশে সমানভাবে ছড়ানো থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রতি ৯টি স্ত্রী গাছের জন্য একটি পুরুষ গাছ প্রয়োজন।

মাদা বা পিট তৈরি: মাদা বা পিটের আয়তন ৫০ সে.মি. × ৫০ সে.মি. × ৫০ সে.মি. (এক হাত করে) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীর হতে হবে। মাদার মাটি খুড়ে এক পার্শ্বে রেখে তাতে নির্ধারিত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার ভালভাবে মিশিয়ে আবার সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে মাদা পূরণ করতে হবে এবং ২-৩ দিন পর তাতে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ মাত্রা: নিচের তালিকা অনুযায়ী জৈব ও রাসায়নিক সার পটলের জমিতে প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	প্রতি মাদায় সারের পরিমাণ			
	চারা রোপণের সময়	রোপণের ২০ দিন পর (১ম কিস্তি)	রোপণের ৬০ দিন পর (২য় কিস্তি)	রোপণের ৯০ দিন পর (৩য় কিস্তি)
গোবর বা আবর্জনা সার	৩-৪ কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	-	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৬০ গ্রাম	-	-	-
এমপি	-	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম

গোবর বা আবর্জনা সার ভালভাবে পচানো প্রয়োজন। পটল দীর্ঘ মেয়াদী সবজি ফসল, এজন্য জুন মাস থেকে ফসল সংগ্রহের পর প্রতি মাসে হেক্টরপ্রতি ১৮ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি এবং ১৪ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এতে ফলন বেশি হবে।

মাচা তৈরি ও অন্যান্য পরিচর্যা: পটল একটি লতানো উদ্ভিদ। বাঁশের কাঠির সাহায্যে চারা গাছকে মাচায় তুলে দেয়া হয়। এক মিটার বা দু'হাত উচ্চতার বাঁশের মাচায় পটলের ভাল ফলন পাওয়া যায়। প্রতিবার ফসল সংগ্রহের পর মরা পাতা ও শাখা ছাঁটাই করা প্রয়োজন। এতে ফলধারী নুতন শাখার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ফলন বেশি হয়। সময়মত সেচ দিয়ে অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ ও নিড়ানী দিতে হবে। যদি জমিতে স্ত্রী গাছের তুলনায় পুরুষ গাছের সংখ্যা কম থাকে তাহলে হাত দিয়ে পরাগায়ণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃত্রিম পরাগায়ণ সকাল ৬-৭ টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কারণ এ সমস্ত পটলের ফুল পরাগায়ণের জন্য উপযোগী থাকে।

রেটুন (মুড়ি) ফসল: যে সমস্ত ফসল একবার সংগ্রহের পর একই গাছ হতে পরবর্তী বছর পরিচর্যার মাধ্যমে ফলন পাওয়া যায়, সে সমস্ত ফসলকে মুড়ি ফসল বলে। পটল গাছ একাধিক বছর বেঁচে থাকে। সুতরাং একবার লাগানোর পর ২-৩ বছর যাবৎ ফসল সংগ্রহ করা যায়। পটল গাছে প্রথম বছর ফলন কম হয়, দ্বিতীয় বছর ফলন বাড়ে, কিন্তু তৃতীয় বছর থেকে আবার ফলন কমতে থাকে। তাই তিন/চার বছর বেশি সময় ধরে ফলন নেওয়া উচিত নয়।

প্রথম বছর ফসল সংগ্রহের পর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মাটির উপরিভাগ বরাবর গাছ কেটে দিতে হবে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে সেচ প্রয়োগের পর 'জো' অবস্থায় গাছের গোড়ায় মাটি কুপিয়ে অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে রেটুন ফসলে আগাম ফলন পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: কচি অবস্থায় সকাল অথবা বিকালে পটল সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণত জাতভেদে ফুল ফোঁটার ১০-১৫ দিনের মধ্যে পটল সংগ্রহের উপযোগী হয়। সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ফল সংগ্রহ করা উচিত। জাতভেদে হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-৪০ টন।

ঢেঁড়সের জাত

বারি ঢেঁড়স ২

উচ্চ ফলনশীল লাইন। এ লাইনটির আগামত্রের বৈশিষ্ট্য সন্তোষজনক (৪০-৪২ দিনে প্রথম ফুল আসে), ফল মাঝারী আকারের লম্বাটে, সবুজ রঙের, ৫-৬টি শিরা বিশিষ্ট, নরম, অল্প আঁশযুক্ত ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ১৩-১৬ গ্রাম। প্রতি গাছে ৩২-৩৮টি ফল ধরে। গড় ফলন প্রায় ১৭-২১ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: ঢেঁড়সের জন্য অপেক্ষোকৃত উচ্চ তাপমাত্রা (রাত্রিকালীনও) প্রয়োজন। তাপমাত্রা ১৫° সেলসিয়াস এর নিচে গেলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে আসে। শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় অবস্থায় ঢেঁড়স জান্মানো যায়। বাংলাদেশের জলবায়ুতে বছরের যে কোন সময় এটি জন্মানো সম্ভব। তবে সাধারণত খরিপ মৌসুমেই এর চাষ হয়ে থাকে। দোআঁশ মাটি ঢেঁড়সের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করতে পারলে বেলে ধরনের মাটিতেও এর চাষ করা যায়। মাটি সুনিষ্কাশিত হওয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে উপযোগী অম্লক্ষারত্ব ৬.০-৬.৮।

জীবন কাল: জীবন কাল প্রায় পাঁচ মাস। তবে জাত ও আবহাওয়া ভেদে কোন কোন সময় কমবেশি হতে পারে।

উৎপাদন মৌসুম: সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ঢেঁড়স লাগানো হয়। তবে বছরের অন্যান্য সময় ও সীমিতভাবে এর চাষ হয়ে থাকে।

বীজের হার: বপনের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪-৫ কেজি (১৫-২০ গ্রাম/শতাংশ) বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি: ভাল ফলন পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করা প্রয়োজন। ঢেলা ভেঙ্গে এবং আগাছা পরিষ্কার করে ভালভাবে জমি তৈরি করে নিতে হবে।

বীজ বপন: সারি করে বীজ বপন করা হয়। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সে.মি. এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সে.মি. রাখতে হয়। বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বপন করলে অঙ্কুরোদগম সহজে হয়।

বপনের সময়: ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য-মে)।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সময় নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। পানি সেচ দেওয়ার পর জমিতে 'জো' আসলে কোদাল দিয়ে মাটির উপরের চটা ভেঙ্গে দিতে হয়। এতে মাটির ভিতরে আলো-বাতাস ঢুকতে পারে এবং মাটি অনেকদিন রস ধরে রাখতে পারে। বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশনের জন্য ২৫-৩০ সেমি উঁচু করে বেড তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ: ঢেঁড়সের জমিতে শতাংশ প্রতি নিম্ন বর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	মোট পরিমাণ	জমি তৈরির সময়	চারা গজানোর ২০ দিন পর	চারা গজানেরা ৪০ দিন পর	চারা গজানেরা ৬০ দিন পর
ইউরিয়া	৬০০ গ্রাম	-	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম	সব	-	-	-
এমপি	৬০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম

*মাটির উর্বরতা ভেদে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে।

ফসল সংগ্রহ: ফেব্রুয়ারি-মার্চে বীজ বপন করলে ৪০-৪৫ দিনে এবং এর পর করলে ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ফুল ফুটতে শুরু করে। তবে জাতভেদে কোন কোন সময় একটু দেরি হতে পারে। ঢেঁড়সের ফল সংগ্রহের সময় নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ফুলের পরাগায়ণের ৭-৮ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। এ পর্যায়ে জাত অনুযায়ী ফল দৈর্ঘ্যে ৮-১০ সে.মি. হয়ে থাকে। ফলের বয়স ১০ দিনের বেশি হলে ফল আঁশময় এব পুষ্টিমান কমে যায়। ফল যত সংগ্রহ করা যায় গাছ তত বেশি ফল উৎপাদন করে। একদিন পরপর এবং সম্ভব হলে প্রতিদিনই ঢেঁড়সের ক্ষেত থেকে ফল সংগ্রহ করা উচিত।

ফলন: উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ঢেঁড়সের ফলন হেক্টরপ্রতি ১৪-১৬ টন (৫৫-৫৬ কেজি/শতাংশ) পাওয়া যায়।

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি উৎপাদন

ফার্টিগেশন বাংলাদেশের জন্য নতুন একটি সেচ প্রযুক্তি যার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন একটি সেচ প্রযুক্তি যার মাধ্যমে পানিতে দ্রবণীয় সার যেমন ইউরিয়া, পটাশ ইত্যাদি পানির সাথে মিশিয়ে সরাসরি গাছের শিকড় অঞ্চলে অল্প অল্প করে প্রয়োগ করা যায়। সেচের সময় সার ও পানি একই সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফসলের গোড়ায় প্রয়োগের ফলে প্রয়োগকৃত সার এবং পানির প্রায় সবটুকুই উদ্ভিদ গ্রহণ করে। ফলে অব্যবহৃত সার চুঁইয়ে ভূ-উপরিস্থ বা ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত করে না। স্ট্রবেরি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ও উচ্চ পুষ্টিমাণের জন্য অত্যন্ত সমাদৃত ফল। স্ট্রবেরি শীত প্রধান দেশের ফল হলেও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উন্নত চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে স্ট্রবেরির চাষ খুবই লাভজনক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৫টি জেলায় স্ট্রবেরির চাষ হচ্ছে। তবে ফসল উৎপাদনে স্ট্রবেরি চাষের ক্ষেত্রে সেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিমিত পানি বা অতিরিক্ত মাটির রসের কারণে আশানুরুপ ফসল পাওয়া যায় না। তাই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে চাষ করলে আশানুরূপ ফলন যেমন পাওয়া যায় তেমনি অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব।

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা রোপণের সময় ও পদ্ধতি: বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য সেপ্টেম্বর- মধ্য অক্টোবর) পর্যন্ত স্ট্রবেরি চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বর মাসেও চারা রোপণ করা যায়। স্ট্রবেরি উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে চারা রোপণের জন্য বেড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এজন্য ১ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সে.মি. উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুইটি বেডের মাঝে ৪০-৫০ সে.মি. নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৫০ সে.মি. দূরত্বে সারিতে ৩০-৪০ সে.মি. দূরের দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের মাত্রা ও ব্যবহার: গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চফলন পেতে হলে স্টবেরির জমিতে (ফার্টিগেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে) হেক্টরপ্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ	হেক্টরপ্রতি পরিমাণ
ইউরিয়া	১৬০-১৮০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এমওপি	১৫০ কেজি
জিপসাম	১৪০ কেজি
বরিক এসিড	১২ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	৮ কেজি
পচা গোবর	৫ টন

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বরিক এসিড ও জিঙ্ক সালফেট সার জমিতে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ইউরিয়া ও এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর ৪-৫ কিস্তিতে সেচের পানির সাথে মিশিয়ে ড্রিপ সেচের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ

স্ট্রবেরি সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে পচে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর স্ট্রবেরি বেড খড় বা কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে পোকার আক্রমণের আশ্রয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মি.মি. ডার্সবান-২০ ইসি ও ৩ গ্রাম ব্যভিস্টিন ডি এম মিশিয়ে খড়ে স্প্রে করে শোধন করে নিতে হবে। স্ট্রবেরি জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিত রানার বের হয় যা ১০-১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। রানার না কাটলে গাছের ফুল ফল উৎপাদন হ্রাস পায়। স্ট্রবেরি ফলন পৌষ মাস হতে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। স্ট্রবেরির সংরক্ষণকাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর গাদাগাদি অবস্থায় না রেখে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে সংরক্ষণ করে যত দ্রুত সম্ভব বাজারজাত করতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ফার্টিগেশন একটি নতুন সেচ প্রযুক্তি যার মাধ্যমে পানিতে দ্রবণীয় সার যেমন- ইউরিয়া, পটাশ ইত্যাদি পানির সাথে মিশিয়ে সরাসরি গাছের শিকড় অঞ্চলে ধীরে ফোটা ফোটা করে প্রয়োগ করা হয়।
- ইহা এমন একটি সেচ পদ্ধতি যা পানির ট্যাংক, পানির ভাল্ব, ছাকনি, টি, মেইন লাইন, সাব-লাইন, জয়েন্টার, কানেক্টর এবং ড্রিপার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গাছের শিকড় অঞ্চলে পানি প্রয়োগ করা হয়।
- সাধারণত প্রতি ১৪০ লিটার পানিতে ১ কেজি সার মিশিয়ে ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সার ও পানি নিয়মিত সেচের মাধ্যমে গাছের শিকড় অঞ্চলে প্রয়োগ করতে হয়।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ইউরিয়া ও এমপি সার চারা রোপণের ১৫দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন পরপর ৪-৫ কিস্তিতে পানির সাথে মিশিয়ে ড্রিপ সেচের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
- এই পদ্ধতিতে প্রতি ২-৩ দিন অন্তর ড্রিপ পদ্ধতিতে অল্প পানি সেচ প্রয়োগ করতে হয়।
- ভূ-উপরিস্থ পানির বাস্পায়ন রোধে এবং ফলের গুণাগতমান সংরক্ষণে ধানের খড় বা প্লাস্টিকের মালচ্ ব্যবহার করতে হবে।

- বর্তমানে ফার্টিগেশন পদ্ধতির যাবতীয় উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি করা সম্ভব।
- স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সেচের পানি বাষ্পায়নজনিত অপচয় রোধকল্পে ফসলের জমিতে সেচ সাধারণত সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া প্রচণ্ড তাপমাত্রার রৌদ্রের সময় যাতে ফসলের জমিতে সেচ না দেওয়া হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফসলের গোড়ায় পানি প্রয়োগের ফলে প্রয়োগকৃত সারের প্রায় সবটুকুই গাছ গ্রহণ করে।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৫০-৫৫ ভাগ ইউরিয়া এবং ২৫ ভাগ পটাশ কম লাগে।
- এই পদ্ধতিতে প্রচলিত ফারো বা প্লাবন সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৪৫-৪৮ ভাগ সেচের পানির কম লাগে।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরির ফলন ৯-১২ টন পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি চাষের আয়-ব্যয়ের অনুপাত ৬:১ এবং প্রতিহেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্ট্রবেরি চাষ করে নিট মুনাফা ১৫-১৮ লক্ষ টাকা অর্জন সম্ভব।
- প্রতি পাঁচ (৫) শতক জমিতে ফসলের জন্য এই পদ্ধতিতে সেচের খরচ হয় মৌসুমে মাত্র ১২০০-১৫০০ টাকা।

সূর্যমুখী উৎপাদনে ঘাটতি সেচ প্রয়োগ প্রযুক্তি

সূর্যমুখী একটি উৎকৃষ্ট তেল ফসল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূর্যমুখীর ব্যাপক চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের খরা ও লবণাক্ত এলাকায় তেল ফল হিসেবে সীমিত আকারে চাষ হচ্ছে। সূর্যমুখী উৎপাদনে সেচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যমুখী ফসলের আশানুরূপ ফলন পেতে হলে কয়েকবার সেচ দিতে হয়। পানির ঘাটতিজনিত

কারণে ফসলের সংকটকাল পর্যায়ে এই প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। ঘাটতি সেচের মাধ্যমে পানির ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপনের সময় ও পদ্ধতি: সূর্যমুখী সারা বৎসর চাষ করা যায়। তবে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় অগ্রহায়ণ মাস (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর) সূর্যমুখী বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নিচে হলে ১০-১২ দিন পর বীজ বপন করা উচিত। খরিফ-১ মৌসুমে অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য (মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে) মাসেও এর চাষ করা যায়। সূর্যমুখীর বীজ সারিতে বপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সে.মি. এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ সে.মি. রাখতে হয়। এতে হেক্টরপ্রতি বীজের পরিমাণ ১০-১২ কেজি প্রয়োজন হয়। বপনের পূর্বেই বীজ শোধন একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য পরিচর্যা যেমন- গাছ পাতলাকরণ, আগাছা দমন, রোগ ও পোকা দমন, ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি প্রচলিত চাষ পদ্ধতির মতই সময়মত করতে হয়।

সারের মাত্রা ও ব্যবহার: সূর্যমুখী চাষের জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণে সার ব্যবহার করলে ফলন ভাল পাওয়া যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৮০-২০০ কেজি
টি এস পি	১৫০-২০০ কেজি
এম পি	১২০-১৫০ কেজি
জিপসাম	১২০-১৭০ কেজি
জিংক সালফেট	৮-১২ কেজি
বরিক এসিড	১০-১২ কেজি
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৮০-১০০ কেজি (খরা প্রবণ এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং বাকি সব সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ২ ভাগ করে প্রথম ভাগ চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় ভাগ ৪০-৪৫ দিন পর ফুল ফোঁটার পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ঘাটতি সেচ এমন একটি প্রযুক্তি যা কার্যকর বাস্পীয় প্রস্বেদন বা মাটির পানির ধারণ ক্ষমতার চেয়ে শতকরা প্রায় ২০ থেকে ৩০ ভাগ পানি কম প্রয়োগ করতে হয়।

- সূর্যমুখী উৎপাদনে সংবেদনশীল বৃদ্ধি পর্যায়েও মাটির পানির ধারণ ক্ষমতার চেয়েও শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কম (ধারণ ক্ষমতার শতকরা ৮০ ভাগ) পানি প্রয়োগ করা হয়।
- নিয়ন্ত্রিত প্লাবন বা ফারো (নালা) বা প্লাস্টিক হুজ পাইপ বা ড্রিপ বা স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে ঘাটতি সেচ দিলে অতিরিক্ত পানির অপচয় রোধ করা যায় এবং ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।
- সেচ সাধারণত সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। প্রচণ্ড তাপমাত্রায় রৌদ্রের সময় যাতে ফসলের জমিতে সেচ না দেওয়া হয় সেদিকে সতর্ক অবলম্বন করতে হবে।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- ঘাটতি সেচ ব্যবহার করার ফলে প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা প্রায় ২০-৩০ ভাগ পানি কম লাগে।
- ঘাটতি সেচ প্রচলিত পূর্ণ সেচের চেয়ে লাভজনক।
- ফসলের ফলনের তেমন কোন ক্ষতি না করে পানির ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- যে সব এলাকায় সেচের পানির ঘাটতি আছে, সেসব এলাকায় বিশেষ করে খরাপ্রবণ বা উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ঘাটতি সেচ প্রয়োগ উপযোগী।

লবণাক্ত অঞ্চলে রবি ফসলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহার

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা কৃষিতে হুমকির সম্মুখীন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাটি ও পানির লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও বৈরি পরিবেশ ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনকে ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। রবি মৌসুমে স্বাদু পানির অভাবে এবং লবণাক্ততার কারণে অধিকাংশ জমি পতিত থাকে ফলে কৃষকরা রবিশস্য জন্মাতে পারে না। কিছু কিছু এলাকায় নালা, পুকুর বা ডোবা থাকলেও উন্নত সেচ

পদ্ধতির অভাবে ফসলে পানি প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় না বা প্রচলিত পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করে থাকলেও আশানুরূপ ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে উন্নত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ ফসল ফলানো সম্ভব। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় মাটির লবণাক্ততা প্রায় এক ডিএস/মি এর নিচে নেমে আসে এবং নভেম্বর থেকে লবণাক্ততা বাড়তে থাকে যা মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে ১২ ডিএস/মি এর চেয়ে বেশি হয়। ফলে লবণাক্ত অঞ্চলে রবি ফসলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহারের ফলে পানির উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ফসলের সংবেদনশীল পর্যায়গুলোতে পরিমিত ভূ-গর্ভস্থ মিঠা পানি প্রাথমিক পর্যায়ে ও খালের/নালা মাঝারী মানের লবণাক্ত পানি পরবর্তী পর্যায়ে সেচ দেওয়া হয়।
- ২.৮-৪.৩ ডিএস/মি মাত্রা ভূ-গর্ভস্থ পানি ফসলের প্রাথমিক পর্যায়ে সেচের জন্য উপযোগী।
- ৪.৬ - ৬.৪ ডিএস/মি মাত্রায় লবণাক্ত খালের/নালা পানি ফসলের মাঝামাঝী বা শেষ পর্যায়ে জমিতে সেচ প্রয়োগ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ফসলের ফলনের খুব একটা তারতম্য হয় না।
- উপকূলীয় অঞ্চলের পতিত জমিতে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারেন।
- উপকূলীয় এলাকায় গম, সরিষা, ভুট্টাসহ অধিকাংশ রবি ফসলের ক্ষেত্রে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ প্রয়োগ অত্যন্ত উপযোগী।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- লবণাক্ত এলাকায় গম, সরিষা, ভুট্টাসহ অধিকাংশ রবি ফসলের ক্ষেত্রে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ প্রয়োগ অত্যন্ত উপযোগী।
- ফসলের মাঝামাঝী বা শেষ পর্যায়ে ৪.৬- ৬.৪ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ত খালের/নদীর পানি ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফসলের ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না।

- মাঝারী মাত্রার লবণাক্ত খালের/নালার পানি ফসল উৎপাদনে সেচের পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় অধিক রবি ফসল উৎপাদন সম্ভব। ফলে ফসলের নিবিড়তা বাড়ার সাথে সাথে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে টমেটো ফসল উৎপাদন

শীতকালে সমগ্র বাংলাদেশে নানা ধরনের সবজি চাষ হয়। বিগত বছরগুলো সবজি চাষের জমি ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উৎপাদিত সবজি দেশের মোট চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগই সরবরাহ করতে পারে। তন্মধ্যে টমেটো হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বাণিজ্যিক সবজি ফসল যা দিন দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া টমেটো ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ একটি শীত ও গ্রীষ্মকালীন সবজি। তাই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। টমেটোতে পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রবি মৌসুমে সেচ দিলে এর ফলন আড়াই থেকে তিনগুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। তাই অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে টমেটো ফসলে পানি প্রয়োগ করলে পানির ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর সহজ ও সময় কম লাগে। কৃষি কাজে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচ পানি সরবরাহ পদ্ধতি সীমিত। বাংলাদেশে শীতকালে সীমিত বৃষ্টিপাত/খরাজনিত কারণে জলাধারে বা ফসলের মাটিতে পানি জমে থাকে না। পানির সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা না থাকায় পানির অপচয় বেড়ে যায় এবং সেচ এলাকাও কমে যায়। উন্নত ও সহজলভ্য সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ করার সাথে সাথে পানির উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা রোপণের সময় ও পদ্ধতি: শীতকালে মধ্য-কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ (নভেম্বর ও মধ্য-ডিসেম্বর) পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। শীতকালে চারার বয়স সাধারণত ৩০-৩৫ দিনের হয়। প্রতি ফারোর কেন্দ্র থেকে অপর ফারোর কেন্দ্র দূরত্ব ৬০ সে.মি. এবং চারা থেকে অপর চারার দূরত্ব ৪০ সে.মি. হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	দেওয়ার সময়
ইউরিয়া ১ম উপরি প্রয়োগ	১৫০ কেজি-১৮০ কেজি	চারা লাগানোর ১০-১৫ দিনের মধ্যে
ইউরিয়া ২য় উপরি প্রয়োগ	১৫০ কেজি-১৮০ কেজি	চারা লাগানোর ২৫-৩০ দিনের মধ্যে
ইউরিয়া ৩য় উপরি প্রয়োগ	১৫০ কেজি-১৮০ কেজি	চারা লাগানোর ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে
টি এস পি	২৫০- ৩৫০ কেজি	বেসার হিসেবে জমি তৈরির শেষ চাষের সময়
এমওপি	১০০ কেজি	জমি তৈরির শেষ চাষের সময় বেসার হিসাবে প্রয়োগ
এমওপি ১ম উপরি প্রয়োগ	৮০ কেজি	চারা লাগানোর ২৫-৩০ দিনের মধ্যে
এমওপি ২য় উপরি প্রয়োগ	৮০ কেজি	চারা লাগানোর ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে
জিপসাম	১২০ কেজি	জমি তৈরির সময়
জিংক সালফেট	২.৫-৩ কেজি	জমি তৈরির সময়
বরিক এসিড	১২-১৫ কেজি	জমি তৈরির সময়

অন্যান্য পরিচর্যাঃ আগাছা দমন, রোগ ও পোকামাকড় দমন, ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি উন্নত ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। গাছ যাতে বাতাসে নূয়ে না পড়ে সেজন্য বাঁশের তৈরি কাঠি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। অতিরিক্ত পার্শ্ব-খুঁটিসহ মরা পাতা ছাঁটাই করে দিতে হবে। ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দানা থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- অল্টারনেট ফারো সেচ হলো এমন একটি সেচ পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতি সেচের সময় একটি ফারো অন্তর অপর ফারোতে পানি সরবরাহ করা হয়।
- দুই ফারোর মধ্যবর্তী ফারো শুষ্ক থাকে যা পরবর্তী সেচের সময় শুষ্ক ফারোতে পানি সরবরাহ করা হয় এবং পূর্বের সেচকৃত ফারোগুলো পরবর্তী সেচের সময় শুষ্ক রাখা হয়।
- উঁচু বেডে সারিতে লাগানো ফসল যেমন- টমেটো, আলু ও ভুট্টা ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে এই সেচ ব্যবস্থা উপযুক্ত।
- চারা লাগানোর পর প্রাথমিক পর্যায়ে (১০-১২ দিন) প্রতি ২-৩ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ১২-১৫ দিন অন্তর অল্টারনেট ফারো পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- এই পদ্ধতিতে ফসলের ফলনের তেমন কোন ক্ষতি না করে প্রচলিত ফারো বা প্লাবন সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা প্রায় ৩০-৩৫% পানি সাশ্রয় হয়।
- এই পদ্ধতি সারিতে লাগানো ফসল যেমন- টমেটো, আলু ও ভুট্টা ইত্যাদি উৎপাদনে খুবই উপযুক্ত।
- এই পদ্ধতিতে ফলের গুণগত মান প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে বেশি পাওয়া যায়।
- এই পদ্ধতিতে কম পানি ব্যবহার করে মুনাফা প্রচলিত সেচ পদ্ধতিরে চেয়ে শতকরা প্রায় ৫-১০ ভাগ বেশি পাওয়া যায়।
- পানির ঘাটতিজনিত কারণে ফসলের সংকটকাল পর্যায়ে এই প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।
- খরাপ্রবণ এলাকায় ফসল উৎপাদনে যেখানে পানির প্রাপ্যতা সীমিত, সেসব এলাকায় সেচের পানি বিতরণের ক্ষেত্রে এটি একটি সহজতর সময়োপযোগী কৃষক বান্ধব সেচ পদ্ধতি।
- সেচের পানি বাষ্পায়নজনিত অপচয় রোধকল্পে ফসলের জমিতে সেচ সাধারণত সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া প্রচণ্ড তাপমাত্রার রৌদ্রের সময় যাতে ফসলের জমিতে সেচ না দেওয়া হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

হাইব্রিড ভুট্টা বীজ উৎপাদনের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা

ভুট্টা একটি উচ্চ ফলনশীল দানাদার শস্য। বাংলাশের চাল গমের পরই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফসল হলো ভুট্টা। বিশ্বব্যাপী মানব ও পশুসম্পদের পুষ্টি উপাদান হিসেবে ভুট্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থায় পানির সীমাবদ্ধতার কারণে টেকসই ও সবল ভুট্টা বীজ উৎপাদনের প্রভাব ফেলছে। যথাযথ সেচের অভাবে বীজের পূর্ণতা, আকার আকৃতি ও গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। ফলে বীজের গুণগতমানের কারণে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। হাইব্রিড ভুট্টার বীজের প্রাণশক্তি কার্যকারিতা, গুণগতমান ও আশানুরূপ ফসল বজায় রাখার জন্য পরিমিতি সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

বপনের সময় ও পদ্ধতি

বাংলাদেশে সারা বছরই ভুট্টা চাষ করা যায়। তবে রবি মৌসুমে চাষ করলে শতকরা প্রায় ২০-৩০ ভাগ বেশি ফলন পাওয়া যায়। রবি মৌসুমে অর্থাৎ মধ্য কার্তিক হতে

অগ্রহায়ণের শেষ (নভেম্বরের শুরু হতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝী) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। যদি অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৯০ বা তার উপরে হয় তাহলে একর প্রতি ৭-৮ কেজি ভুট্টা বীজ লাগবে। বীজ সারিতে বপন করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সে.মি.।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ভুট্টা চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৭২-৩১২ কেজি
টিএসপি	১৬৮-২১৬ কেজি
এম পি	৯৬-১৪৪ কেজি
জিপসাম	১৪৪-১৬৮ কেজি
জিংকসালফেট	১০-১৫ কেজি
বরিক এসিড	৫-৭ কেজি
গোবর	৪-৬ টন

জমি তৈরির শেষ চাষ ও মই দেওয়ার আগে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে চাষ দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০-৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত চারা তুলতে হবে এবং জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ভুট্টা চাষের অন্যান্য পরিচর্যা প্রচলিত উন্নত পদ্ধতির মতই অনুসরণ করতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ভুট্টায় আশানুরুপ ফলন পেতে হলে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এলাকাভেদে ৩ থেকে ৪টি সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।
- মাটির প্রকারভেদে নিয়ন্ত্রিত প্লাবন প্রচলিত ফারো বা অল্টারনেট ফারো বা স্প্রিংলার পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে।
- বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (৪-৬ পাতা পর্যায়) প্রথম সেচ দিতে হবে।
- বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে (৮-১২ পাতা পর্যায়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে (মোচা বের হওয়া পর্যায়) তৃতীয় সেচ দিতে হবে।

❀ বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার আগের পর্যায়) চতুর্থ সেচ দিতে হবে।

❀ সেচের পানি বাষ্পায়ন জনিত অপচয় রোধকল্পে ফসলের জমিতে সেচ সাধারণত সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া প্রচণ্ড তাপমাত্রার রৌদ্রের সময় যাতে ফসলের জমিতে সেচ না দেওয়া হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

❀ ভুট্টার ফুল ফোঁটা ও দানা বাঁধার সময় কোন ক্রমেই জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

❀ গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯ এর গুণগত মানের বীজ উৎপাদনের জন্য চারটি সেচ অত্যাবশ্যক।

❀ ভাল মানের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভুট্টার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি পর্যায়ে সেচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

❀ পরিমিত সেচ প্রয়োগের ফলে ভুট্টা বীজের পুষ্ঠমান ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধির ফলে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে বেশি হয়।

❀ ভুট্টা চাষে উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নিট মুনাফা প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে বেশি পাওয়া সম্ভব।

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে রসুন উৎপাদন

স্প্রিংকলার সেচ হলো এমন একটি সেচ পদ্ধতি যা প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের অনুরূপ। এই পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ্য বা ভূপৃষ্ঠস্থ জলাধার হতে পাম্পদ্বারা পাইপ ও স্প্রিংকলার সিস্টেমের মাধ্যমে পানি বাতাসে স্প্রে করা হয় যা ছোট ছোট ফোঁটা আকারে ফসলের আচ্ছাদন জুড়ে মূলাঞ্চলকে সিক্ত করে। সেসব ফসলের মূল অগভীর, ঘন ঘন সেচ ও পারিমিত পানি প্রয়োগ করতে হয়, তাছাড়া বেলে মাটির ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ায় স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সেসব

ক্ষেত্রে স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে পানির ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মসলা জাতীয় ফসলের মধ্যে রসুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফসল। রসুন বিভিন্ন রকমের রান্নার গন্ধ, রুচি ও স্বাদ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও রসুন ব্যবহার হয়ে থাকে। রসুনে সাধারণত ৬২% পানি, ২৯.৮% কার্বোহাইড্রেট, ৬.৩% প্রোটিন, ০.১% তেল, ১% খনিজ পদার্থ, ০.৪% আঁশ এবং ভিটামিন 'সি' আছে। বাংলাদেশের চাহিদার তুলনায় রসুনের উৎপাদন অনেক কম। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রসুনের উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তাছাড়া যথাযথ পানির বিতরণ ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত সেচের কারণেও রসুনের আশানুরূপ ফসল উৎপাদন হয় না। যেহেতু রসুন একটি অগভীর কন্দ জাতীয় ফসল, তাই ঘন ঘন ও হালকা সেচের জন্য স্প্রিংকলার পদ্ধতি একটি উপযুক্ত সেচ প্রযুক্তি।

রোপণের সময় ও পদ্ধতি: মধ্য অক্টেবর থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রসুনের কোয়া লাগানোর উপযুক্ত সময়। ৪-৫টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এসময় জমিতে আগাছা থাকলে তা পরিস্কার করতে হবে। রসুনের কোয়া রোপণের সময় এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে ১০ সে.মি.। সাধারণত ০.৭৫-১ গ্রাম রসুনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগ

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	২১৭ কেজি
টিএসপি	২৬৭ কেজি
এমওপি	৩৩৩ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি
গোবর	৫ টন

রসুনের জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে জমি ভালভাবে তৈরি করতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি দুই কিস্তিতে সমানভাগে রসুন বপনের ২৫ দিন এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এমন একটি সেচ পদ্ধতি যা জলাধার হতে পাম্প, পানি বিতরণের পাইপ এবং স্প্রিংকলার সিস্টেমের মাধ্যমে পানি বাতাসে স্প্রে করে ছোট ছোট ফোঁটা আকারে বৃষ্টির মত করে ফসলের জমিতে প্রয়োগ করা হয়। ওভারহেড সেচ পদ্ধতি নামেও পরিচিত।

- খরাপ্রবণ এলাকায় সেখানে পানির ঘাটতি আছে সেসব অঞ্চলে এই প্রযুক্তিতে সেচ প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- ফসলের চাহিদা অনুযায়ী ৮ থেকে ১০ দিন অন্তর অন্তর স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে রসুনে সেচ প্রয়োগ করতে হয়।
- সেচের পানি বাস্পায়নজনিত কারণে অপচয় রোধ করার জন্য ফসলের জমিতে সেচ সাধারণত সকালে, বিকালে বা রাত্রে প্রয়োগ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই প্রচন্ড ঝড় বা রোদ্রের সময় স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া যাবে না।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- এই পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা প্রায় ২০-২৫ ভাগ পানি সাশ্রয় হয়।
- প্রতি সেচে ফসলের গোড়ায় পরিমিত পানি ব্যবহারের ফলে প্রয়োগকৃত পানি ও সারের প্রায় সবটুকুই গাছের উপকারে আসে।
- এই পদ্ধতিতে কম পানি ব্যবহার করেও প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা প্রায় ১৫-২০ ভাগ বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব।
- স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে রসুন উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের অনুপাত ১ : ৫ থেকে ২ : ০ পাওয়া যায়।
- বর্তমানে স্প্রিংকলার পদ্ধতির যাবতীয় উপকরণ স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।
- ঘন ঘন পরিমিত সেচ প্রয়োগের কারণে ফসলে কখনও পানি সংকট বা জলাবদ্ধতায় সৃষ্টি হয় না। যার ফলে গাছের বৃদ্ধি ও ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

বারি আলু রোপণ যন্ত্র

বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া আলু চাষের উপযোগী। উত্তরাঞ্চলের প্রায় সব জেলা ও মুন্সিগঞ্জে আলু বেশি চাষ হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ৪.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। আলু চাষ পদ্ধতি বিশেষ করে আলু রোপণ শ্রমিক নির্ভরশীল, সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল পদ্ধতি। গ্রাম এলাকায় কৃষি শ্রমিক দিন দিন হ্রাস পাওয়ার ফলে আলু রোপণ মৌসুমে কৃষক শ্রমিকের অভাবে সময়মত আলু রোপণে ব্যর্থ হয়। অথচ কাঙ্খিত ফলন পাওয়ার জন্য সঠিক সময়ে আলু লাগানো একটি পূর্ব শর্ত। পাওয়ার টিলার বাংলাদেশের কৃষিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। জমি চাষ, পানি সেচ, ফসল মাড়াই, ধান ভাংগানো, মালামাল পরিবহণ ইত্যাদি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করছে। এ পাওয়ার টিলারকে কাজে লাগিয়ে আলু রোপণ যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে যা ছোট আকারে এবং সহজে ব্যবহার করা যায়।

বারি আলু রোপণ যন্ত্র দ্বারা রোপণকৃত আলু ফসলের মাঠ

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- আলু রোপণ যন্ত্রটি একসাথে মাটি কর্ষণ, নির্ধারিত দূরত্বে বীজ স্থাপন, আলুবীজ ঢেকে দেওয়া এবং বেড তৈরি করে।
- এই যন্ত্র দ্বারা এক সারিতে বীজ রোপণ করে যেখানে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সে.মি. এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২০-২৫ সে.মি. বজায় রাখা যায়।
- যন্ত্রটি দ্বারা ৪ জন লোক প্রতিদিন এক হেক্টর জমিতে আলু রোপণ করতে পারে যেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে ৬৭ জন লোকের প্রয়োজন হয়।
- যন্ত্রটি উচ্চমাত্রার শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ী।
- যন্ত্রটি স্থানীয় প্রকৌশল কারখানায় তৈরি করা যায়।

যন্ত্রের বিবরণ

- যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত।

- মাপ: ৮০০×৭০০×৯৫০ মি.মি.
- কাপ টাইপ আলু রোপণ মেকানিজম যেখানে কাপগুলো রাবারের তৈরি ৪০ মি.মি. এবং একটি চওড়া থ্রেডেড বেল্টের উপর ১০ জোড়া কাপ বসানো থাকে।
- টিলারের চাকার ব্যাসের সাথে সংগতি রেখে মিটারিং কাপগুলো বসানো থাকে যা আলু রোপণের দূরত্ব ঠিক রাখে।
- যন্ত্রটি চেইন ও স্প্রোকেটের সাহায্যে শক্তি সঞ্চালন করে।

কার্য প্রণালী: পাওয়ার টিলারের ঘুর্ণায়মান ফাল পুর্ণবিন্যাস করে ২৪ টি ফাল সংযোগ করা হয়েছে। যার ১২টি ফাল বাম থেকে ডানে এবং ১২ টি ফাল ডান থেকে বামে মুখ করে সাজানো থাকে। ঘুর্ণায়মান ফাল জমি চাষ করে ফারো তৈরি করে। মিটারিং ডিভাইস একটা করে আলু উঠিয়ে নির্দিষ্ট দূরে স্থাপন করে, বেড তৈরি ও ঐ আলু বীজ ঢেকে দেয়। যন্ত্রটি একসঙ্গে আলু রোপণ এবং বেড তৈরি করে।

কার্যক্ষমতা: ০.০১ হেক্টর/ঘণ্টা

মূল্য: ৪০,০০০ টাকা (ইঞ্জিন ছাড়া)

বারি উন্নত বেড প্লান্টার

আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে বেড প্লান্টিং পদ্ধতি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে ফসলের ফলন অপরিবর্তিত রেখে প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করে। ফসলের আন্তঃপরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা সাশ্রয়ী ও সহজতর করে। বহু আগে থেকেই বাংলাদেশের কৃষকগণ তাদের আলু, ভুট্টা, মরিচ ও শাকসবজিসমূহকে অতি বৃষ্টির দরুন সৃষ্ট জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করার জন্য বেডের রোপণ পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। তারা হাত দিয়ে বেড তৈরি করেন যা খুবই কষ্টকর, সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল । কৃষকরা বেড পদ্ধতি প্রযুক্তি

বারি উন্নত বেড প্লান্টার বেড প্লান্টিং পদ্ধতিতে ফসলের মাঠ

হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এর মাধ্যমে চাষাবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয়সমূহকে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শ্রমিক, সাশ্রয় বেড তৈরির সময় বাঁচানো এবং ফসলের ফলন বড়ানোর পাশাপাশি কৃষকের আয় বাড়ানোর জন্য বেড প্লান্টার উদ্ভাবন করে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- বারি বেড প্লান্টার পাওয়ার টিলারের সাথে সংযুক্ত করে এক চাষে এবং একই সাথে মাটিতে বেড তৈরি, সার প্রয়োগ ও বীজ বপনের কাজ সম্পন্ন করতে পারে।
- এই যন্ত্রে সার প্রয়োগ ও বীজ বপনের জন্য আলাদা বীজ ও সার বক্স রয়েছে।
- এই যন্ত্রে উন্নত ধরনের ইনক্লাইন্ড প্লেট সিড মিটার ব্যবহার করা হয় যা সঠিক দূরত্বে ও সঠিক হারে বীজ বপন করতে পারে।
- বেড প্লান্টার দ্বারা গম, ভুট্টা, মুগডাল, পাট, ধান, তিলসহ বিভিন্ন প্রকার সবজির বীজ সফলভাবে বপন করা সম্ভব।
- এই যন্ত্রটি একজন চালক সহজে বসে চালাতে পারে।
- বেডে ফসল ফলনে উৎপাদন খরচ কমে, মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও দূষণ মুক্ত পরিবেশ পাওয়া যায়।
- বেডে ফসলের অবশিষ্টাংশ রেখেই শূণ্য চাষে বীজ বপন করা যায়।
- সেচর পানি প্রায় ৩০-৩৫% কম লাগে
- বেডে ফসল করলে জলাবদ্ধতা হয়ে ফসলের ক্ষতি হয় না ।
- স্থায়ী বেডে কয়েক বছর চাষ করলে জমিতে জৈব সারের পরিমাণ বাড়ে এবং কেঁচো বাস করায় জমির উর্বরতা বাড়ে।
- বেডে ফসল করলে ইঁদুরের উৎপাত কমে।
- শতকরা ১৫-২০ ভাগ বীজ কম লাগে
- শতকরা ৬০ ভাগ চাষাবাদ খরচ কমায়।

কার্যপ্রণালী

যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের পেছনে চারটি নাট-বোল্ট দিয়ে যুক্ত করতে হয়। চাকার শ্যাফটের সাথে স্প্রোকেট স্থাপন করে চাকার শ্যাফটের স্প্রোকেট ও মিটারিং শ্যাফটের মধ্যে দিয়ে চেইন দিয়ে সংযোগ দিতে হয়। বীজ হার ঠিক করতে হয়। বেড শ্যাপারের পরিবর্তনশীল অংশ নাড়াচাড়া করে ৬০-৭০ সে.মি. এর কাঙ্খিত বেড সাইজ ঠিক করতে হবে। সবগুলো নাট ঠিকমত টাইট করে 'জো' সম্পন্ন মাঠে যন্ত্রটিকে নিয়ে প্রথমে পাওয়ার টিলার চালু করা হয়। অতঃপর রোটারিতে

শক্তি সরবরাহ করা হয়। চাকার গতি সঞ্চালনের পূর্বেই বীজের লিভারটি চালু করে এরপর ধীরে ধীরে সামনের দিকে যন্ত্রটি চালাতে হয়।

পরীক্ষার ফলাফল

বেডের উচ্চতা: ১৫-২০ সে.মি.
বেডের প্রস্থ: ৬০ সে.মি.
বেড থেকে বেডের মধ্যবর্তী নালা: ২০ সে.মি.
কার্যক্ষমতা: ০.১০ হেক্টর/ঘণ্টা
মূল্য: ৪০,০০০/- টাকা (ইঞ্জিন ছাড়া)

বারি বহুফসলী বীজ বপন যন্ত্র

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ধান-গম-পতিত একটি প্রধান শস্য পর্যায়। এই শস্য পর্যায়ে কৃষক সাধারনত কর্দমাক্ত জমিতে হাতে আমন ধান রোপণ করেন। পরবর্তীতে রোপা আমন ধান কেঁটে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে হাতে ছিটিয়ে রবি মৌসুমে গমের বীজ বপন করে যা খুব ধীর গতি, সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল চাষাবাদ পদ্ধতি। গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা প্রায় ৭০ ভাগেরও বেশি জমিতে দেরিতে গম বপনের প্রধান কারণ হচ্ছে সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাব। দেশের উত্তরাঞ্চলসহ দেশের প্রায় আট লক্ষ হেক্টর জমিতে গমের চাষ হচ্ছে । কৃষক উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন পর্যায় নিয়ে আসতে, জমিস্থ আর্দ্রতা সংরক্ষণে, জমিতে পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্ঠাংশের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে, দুই ফসলের মধ্যর্বতী সময় (Turn around time) কমাতে; সর্বোপরি কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্র খুবই লাগসই একটি প্রযুক্তি।

বারি বহুফসলী বীজ বপন যন্ত্র

বীজ বপন যন্ত্র দ্বারা বপনকৃত ফসলের মাঠ

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- এই যন্ত্রটি দ্বারা একই সাথে জমি চাষ, সারিতে বীজ বপন, সার দেওয়া ও জমি সমান বা মই দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়। বীজ বপনের জন্য আলাদা করে জমি চাষের প্রয়োজন হয় না।

- গম, মুগডাল, মসুর, ছোলা, ভুট্টা বাদাম, পাট, তিল ও ধানের বীজ বপন করা যায়। তবে ফসল ভেদে বীজ মিটার প্লেট পরিবর্তন করতে হয়।
- ফসল অনুযায়ী বীজ হার নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময় কমায়।
- একই গভীরতায় বীজ বপর করা যায়, বীজ উত্তমভাবে মাটির সংস্পর্শে আসে বিধায় গজায় বেশি
- শতকরা ১৫-২০ ভাগ ফসল বৃদ্ধি পায় এবং বীজ বপন বাবদ খরচ শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ সাশ্রয় হয়।

যন্ত্রের বিবরণঃ যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত, মাপ: ৭২০×১৩২০×৭০০ মি. মি. সারির দূরত্ব: ২০ সে.মি.(সারি কম বেশি করা যায়), সারির সংখ্যা: ৬টি (সারি কম বেশি করা যায়), চাষের প্রশস্থতা: ১২০০ মি.মি., চাষের গভীরতা: ৬০ মি.মি., বীজ বপনের গভীরতা: ২০-৫০মি.মি. বক্সের বীজ ধারণ ক্ষমতা: ২০ কেজি

কার্যপ্রণালীঃ এই যন্ত্র দিযে একবারেই চাষ, লাইনে বীজ বপন ও মইয়ের কাজ হয়ে যায়। বীজবপন যন্ত্রের জন্য রোটাভেটর খুলে যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের সঙ্গে যংযুক্ত করতে হয়। চাকার শ্যাফটের স্প্রোকেট ও মিটারিং শ্যাফটের মধ্যে চেইন দিয়ে সংযোগ দিতে হয়। ফসল অনুযায়ী সারি থেকে সারির দূরত্ব ও গভীরতা ঠিক করতে হয়। জমির এক প্রান্তে পাওয়ার টিলার নিয়ে বীজবপন যন্ত্রে পরিমাণমত বীজ ঢালতে হয়। পাওয়ার টিলারের গিয়ার ২ নম্বরে রেখে (গতি ২.০ থেকে ২.৫ কিমি/ঘণ্টা) যন্ত্রটি চালানো হয় এবং প্লাস্টিক টিউবের মধ্য দিয়ে সারিতে ঠিকমত বীজ পড়ছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হয়। জমির শেষ প্রান্তে গিয়ে পাওয়ার টিলার ঘুরানোর সময় এর হাতলের সহায্যে বপন যন্ত্রটি উঁচু করে ঘুরাতে হয় এবং পাশের সারিতে বীজ বোনা হয়। মিটারিং ডিভাইস ঘুরছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কার্যক্ষমতাঃ ০.১২-০.১৫ হেক্টর/ঘণ্টা

মূল্যঃ ৭০,০০০ (ইঞ্জিন ছাড়া)।

হরমোন প্রয়োগে বেগুন চাষ

উদ্ভিদ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণে হরমোনের ভূমিকা সর্বজন বিদিত। বেগুন উৎপাদনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে এর ফুল ঝরে যাওয়ার জন্য গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা কমে যায়। ফলশ্রুতিতে এ সবজিটির ফলন কম হয়। বেগুনের গাছ চার প্রকার ফুল উৎপাদন করে, দীর্ঘ গর্ভদণ্ডধারী, মাঝারী গর্ভদণ্ডধারী, খাটো ভুয়া গর্ভদণ্ডধারী এবং প্রকৃত খাটো গর্ভদণ্ডধারী। প্রথমোক্ত শ্রেণির ফুলের গর্ভমুণ্ড পরাগধানী কর্তৃক সৃষ্ট কোণকের বাইরে চলে আসে। দ্বিতীয় শ্রেণির ফুলে গর্ভমণ্ড কোণকের সমান উচ্চতায় অবস্থান করে। এ দু'প্রকার ফুল থেকে স্বাভাবিকভাবে ফল উৎপন্ন হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ফুলের গর্ভমুণ্ড কোণকের ভিতরে অনেক নিচে থেকে যায়, এসব ফুল থেকে সাধারণত ফল উৎপন্ন হয় না। হরমোন প্রয়োগ করার ফলে খাটো ভুয়া গর্ভদণ্ডধারী ফুল মাঝারী গর্ভদণ্ডধারী ফুলে পরিবর্তন হয় এবং ফল ধরে।

চিত্র ১: ১) দীর্ঘ গর্ভদণ্ডধারী ফুল, ২) মাঝারী গর্ভদণ্ডধারী ফুল ৩) খাটো ভুয়া গর্ভদণ্ডধারী ফুল ও ৪) প্রকৃত খাটো গর্ভদণ্ডধারী ফুল

বেগুন গাছে এবং ফুলে বিভিন্ন প্রকার হরমোন ও বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্য প্রয়োগ করে আগাম ও অধিক সংখ্যায় ফল ধরানো যায়। এসব দ্রব্য ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি, ফুলঝরা নিবারণ এবং ফলের আকার বৃদ্ধি করে। প্রতিকূল পরিবেশ হরমোনের কার্যকারিতা অধিক। যেসব দ্রব্য বেগুন গাছে ফলধারণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে তার মধ্যে ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড (NAA), প্লানোপিক্স (Planofix) যার প্রধান উপাদান NAA এবং জিবারেলিক এসিড (GA_3) অন্যতম।

বাংলাদেশে রবি মৌসুমে সব জাতের বেগুনের চাষ করা যায়, কিন্তু খরিফ মৌসুমে তা সম্ভব নয়। খরিফ মৌসুমে চাষের জন্য উপযুক্ত জাত হচ্ছে বারি বেগুন-৮ এবং বারি বেগুন-১০। খরিফ মৌসুমে এসব জাতের ফলন রবি মৌসুমের তুলনায় ফলন অনেক কম হয়। খরিফ মৌসুমে ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড বা Planofix হরমোন সিঞ্চন করলে গাছে ফলধারণ বৃদ্ধি পায় এবং হেক্টরপ্রতি ফলন বেড়ে যায়।

চিত্র ২: হরমোন প্রয়োগকৃত বেগুনের মাঠ

চিত্র ৩: বারি বেগুন- ৫

চিত্র ৩: বারি বেগুন - ১০

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ
ফসল	বেগুন
জাত	বারি বেগুন - ৫, বারি বেগুন-৮ ও বারি বেগুন -১০
বীজ বপনের সময়	রবি মৌসুম-অক্টোবর; খরিফ মৌসুম- ফেব্রুয়ারি
চারা রোপণের সময়	রবি মৌসুম নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ এবং খরিফ মৌসুম মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ
রোপণ পদ্ধতি	সাধারণত ৪০-৪৫ দিনের চারা ১০০ সে.মি. × ৭০ সে.মি. দূরত্বে রোপণ করতে হয়।
প্রয়োগকৃত হরমোনের মাত্রা	জিবারেলিক এসিড ৩০ পিপিএম ও ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড ৪০ পিপিএম। তাছাড়া বেগুন গাছে প্লানোফিক্স প্রয়োগ করা যায়। প্লানোফিক্স বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।
হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি	সাধারণত চারা লাগানোর ৪৫ দিনের মধ্যে বেগুন গাছে ফুল আসতে শুরু করে। প্রথম ফুল আসলে নির্দিষ্ট মাত্রায় হরমোন প্রয়োগ করতে হয়। তারপর ১৫ দিন পর পর আরো তিন বার বেগুন গাছে হরমোন প্রযোগ করতে হবে।
সার ও অন্যান্য অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা	অনুমোদিত মাত্রায় বিভিন্ন সার প্রয়োগ করতে হবে। আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গাছের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় অনুমোদিত কীটনাশক ট্রেসার ১ মি.লি. ২.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা লাগানোর পর থেকে ফুল আসা পর্যন্ত ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কোন ধরনের মাইটিসাইড বা ওমাইট ১ মি.লি. ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা লাগানোর পর থেকে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। গাছের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে ফেরোমেন ট্রাপ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং তা অনেকগুণে সাশ্রয়ী।
প্রযুক্তি ব্যবহারে সম্ভাব্য ফলন	হেক্টরপ্রতি ১৮-২০% বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব।
ফসল সংগ্রহ	ফসল সংগ্রহ রবি মৌসুম -মার্চ থেকে মে; খরিফ মৌসুম- মে থেকে জুলাই
হরমোন বাবদ খরচ	প্রতি শতাংশে হরমোন বাবদ খরচ-১০০.০০ টাকা; স্প্রে করার জন্য প্রতি শতাংশে খরচ -২০০০.০০ টাকা
প্রতি শতাংশে নিট লাভ	১,৫০,০০০.০০ টাকা

ঝাড় শিমের সার ব্যবস্থাপনা

ঝাড় শিম একটি পুষ্টিকর সবজি। ইংরেজী নাম French bean. তাই একে ফরাসী শিমও বলা হয়। এ সবজিটির বৈজ্ঞানিক নাম *Phaseolous vulgaris* L. যা Leguminosae পরিবারের অন্তর্গত। Leguminosae পরিবারের উদ্ভিদকে সাধারণভাবে লিগিউম উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে। এ পরিবারের উদ্ভিদসমূহের শিকড় *Rhijobium* নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি (Nodule) সৃষ্টি করে এর মধ্যে বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে। এ জন্য এ পরিবারের ফসলসমূহ চাষ করতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম লাগে। কিন্তু ঝাড়শিম অন্যান্য লিগিউম জাতীয় ফসল থেকে একটু আলাদা। ঝাড়শিমের শিকড়ে গুটি সৃষ্টি করে যে রাইযোবিয়াম (*Rhijobium*), সেগুলো বাংলাদেশের মাটিতে কম। সেজন্য এ ফসলটির শিকড়ে গুঁটি সৃষ্টি হয়ে নাইট্রোজেন তেমন একটা সংবন্ধন হয় না। ফলে ফসলটি চাষ করার জন্য নাইট্রোজেন এর বেশি দরকার হয়। দেশি শিমের নাইট্রোজেনের পরিমাণ অপেক্ষা ঝাড়শিমে প্রায় ৪-৪.৫ গুন বেশি নাইট্রোজেন লাগে। নাইট্রোজেনের সাথে ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, জিংক ও বোরণ পুষ্টি উপাদান নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। বারি ঝাড়শিম-২ জাতের কচি পড রান্না অথবা ভাজি করে খাওয়া হয়। কচি পড ভিটামিন কে, ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম, ফোলেট এবং আয়রন এর চমৎকার উৎস। সবুজ পড থায়ামিন, রিবোফ্লবিন, কপার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, প্রোটিন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড এবং নায়াসিন সমৃদ্ধ। কচি পডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দ্রবণীয় আঁশ বিদ্যমান। দ্রবণীয় আঁশ রক্তের কোলেস্টেরোল কমাতে সাহায্য করে।

চিত্র ১: বারি ঝাড় শিম-২ (বৃদ্ধি পর্যায়)

চিত্র ২: বারি ঝাড় শিম-২ এর সংগৃহীত পড

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ
ফসল	ঝাড় শিম
জাত	বারি ঝাড় শিম-২
জমি ও মাটি	সব ধরনের মাটিতে চাষ করা যায়। তবে বেলে দো-আঁশ মাটি ঝাড় শিমের জন্য সবচেয়ে ভাল। উপযোগী মাটির পিএইচ ৫.৪-৬.০।
বীজ বপনের সময়	নভেম্বর
বীজ শোধন	বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজ ২.৫০ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ছত্রাক নাশক দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। বীজ ও ছত্রাক নাশকের মিশ্রণে সামান্য পানি মিশাতে হয় যাতে ছত্রাকনাশক বীজের গায়ে ভালভাবে লেগে থাকে।
বপন পদ্ধতি	সাধারণত ২৫ সে.মি.×১০ সে.মি.দূরত্বে বপন করতে হয়। প্রতি গর্তে ২টি করে বীজ হাত দ্বারা বপন করতে হয়। পরবর্তীতে ১৫ দিন পর বীজ গজালে প্রতি গর্তে একটি স্বাস্থ্যবান চারা রেখে অন্য চারাটি তুলে ফেলতে হবে।
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	২৬০
টিএসপি	৯০
এমওপি	১২৫
জিপসাম	৫৫
জিংক সালফেট (মনো)	৮
বোরিক এসিড	৬
কম্পোস্ট (টন/হেক্টর)	৫
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ কম্পোস্ট, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংকসালফেট, বোরিক এসিড এবং তিনভাগের এক ভাগ ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ ভাগে ভাগ করে বীজ বপনের যথাক্রমে ২০ এবং ৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
সেচ প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া সার প্রয়োগ অনুসারে সেচ দিতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে একটি সেচ দিয়ে 'জো' অবস্থায় বীজ বপন করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভাল হয়। বীজ বপনের ৫০ দিন পর আরেকবার সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা	আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। ফসলে গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ব্যাভিস্টিন ২ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ২ বার ১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহ	ফল সেট হবার ১০-১২ দিন পর পড হাত দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। ফসলের জীবন কালে ৪-৫ বার পড সংগ্রহ করা যায়। বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিন পর পড সংগ্রহ করা যায়।
প্রযুক্তি ব্যবহারে সম্ভাব্য ফলন	হেক্টরপ্রতি ১৫-১৮ টন অপক্ক পড পাওয়া সম্ভব।

বরবটির ফল ছিদ্রকারী পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বিবরণ

ফল ছিদ্রকারী পোকা (*Eucrysops cnejus*) বরবটি ফসলের একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকার কীড়া ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও ফল ছিদ্র করে ভেতরের অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। সাধারনত কীড়ার মুখ ছিদ্রের ভিতর এবং পেছনের অংশ ছিদ্রের বাহিরে থাকতে দেখা যায়। আক্রান্ত ফুলের কুঁড়ি ও ফুল সাধারনত ঝরে পড়ে। আক্রান্ত বরবটি খাবার অনুপযোগী হয়ে পড়ে, ফলে এর বাজার মূল্য কমে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পুরো বরবটির ফলনই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকা সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব।

ক) সপ্তাহে একবার আক্রান্ত ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও ফল সংগ্রহ করে কমপক্ষে একহাত গভীর গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে।

খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করে পোকার কীড়া বা পুত্তলি ধ্বংস করতে হবে।

গ) প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবি পোকা, *ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ* (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবি পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখান হতে ৪০,০০০ হতে ৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ ট্রাইকোগ্রামা বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারীপরজীবি পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি হিসেবে) পর্যায়ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করতে হবে।

ঘ) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব কীটনাশক স্পাইনোসেড (ট্রেসার ৪৫এসসি) প্রতিলিটার পানিতে ০.৪ মিলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বরবটির ফল ছিদ্রকারী পোকার জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ ও ক্ষতির প্রকৃতি

ঢেঁড়শের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা (*Earias vittella*) ঢেঁড়শ ফসলের একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা। ডিম থেকে বাদামী রঙের কীড়া বের হয়ে ডগা বা কচি ফলে আক্রমণ করে। কীড়া ডগা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ভেতরের নরম অংশ কুরে কুরে খায়। আক্রান্ত ডগা নেতিয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায় ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। কীড়া ফল ছিদ্র করে ভিতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে বাজারজাতকরণের অনুপযুক্ত করে ফেলে। বেশি আক্রমণ হলে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকা সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব।

ক) সপ্তাহে একবার মরা বা নেতিয়ে পড়া ডগা, আক্রান্ত ফুল ও ফল সংগ্রহ করে কমপক্ষে একহাত গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করে পোকার কীড়া বা পুত্তলি ধ্বংস করতে হবে।

গ) প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবি পোকা, ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবি পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখান হতে ৪০,০০০ হতে ৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ ট্রাইকোগ্রামা বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবি পোকা, ব্রাকন হেবিটর (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি হিসেবে) পর্যায়ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করতে হবে।

ঘ) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব কীটনাশক স্পাইনোসেড (ট্রেসার ৪৫এসসি) প্রতিলিটার পানিতে ০.৪ মিলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঢেঁড়শের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপ

ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত ঢেঁড়শের ডগা ও ফল

সরিষা-বোরো-পাট-রোপা আমন ফসল বিন্যাস

বৃহত্তর টাংগাইল অঞ্চলে সরিষা-বোরো-রোপা আমনের পরিবর্তে চার ফসল ভিত্তিক সরিষা-বোরো-পাট-রোপা আমন শস্য বিন্যাসের সুপারিশ করা হয়। এলেঙ্গা এবং মধুপুর এলাকায় কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে উন্নত এই ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন করা হয়। কৃষকের প্রচলিত জাতের পরিবর্তে উন্নত জাত ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফলন পাওয়ার পাশাপাশি একই জমিতে বছরে চার ফসল করার ফলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পায় ও কৃষক লাভবান হয়। এতে ধানের সমতুল্য ফলন শতকরা প্রায় ২২ ভাগ বেড়ে যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
ফসল	সরিষা	বোরো	পাট	রোপা আমন
জাত	বারি সরিষা-১৪	ব্রি ধান-২৮	ও-৯৮৯৭	বিনা ধান-৭
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৬	৫০	৬	৫০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সে.মি.)	ছিটিয়ে	২৫ × ১৫	ছিটিয়ে	২৫ × ১৫
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বর ৩য় সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহ	মে এর ২য় সপ্তাহ	আগস্টের ২য় সপ্তাহ
ফসল সংগ্রহের সময় কাল	ফেব্রুয়ারি এর ১ম সপ্তাহ	মে এর ২য় সপ্তাহ	আগস্টের ২য় সপ্তাহ	নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	**এলেঙ্গা এলাকার জন্য**			
ইউরিয়া	১১৭	২০৬	১৬৩	১৪৩
টিএসপি	৭৫	৩৫	৩৫	৯০
এমওপি	৪৮	৫৪	৬২	১৬
জিপসাম	৬৩	৫৬	৩৮	৫০
জিংক সালফেট	-	৩.০	৩.০	৬.০
বরিক এসিড	১০	-	০	০
মধুপুর এলাকার জন্য				
ইউরিয়া	২৫০	২২০	১৮০	১৯৮
টিএসপি	১৭০	৫০	৯০	১০৫
এমওপি	১২০	৫৪	১৩০	৭৪
জিপসাম	১৯৪	৬৩	১২৫	৭৫
জিংক সালফেট	-	৫৫	০	০
বরিক এসিড	১২	-	০	০

(চলমান)

সার প্রয়োগ পদ্ধতি :				
	সবটুকু টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বোরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া বপনের ২০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া চারা লাগানোর ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া বপনের ২০-২৫ এবং ৪০-৪৫ দিন পর সমান দুই ভাগে ভাগ করে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া চারা লাগানোর ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
ফলন (টন/হেক্টর)	১.৫০	৫.৭০	২.৫০	৪.৭৩

আলু + ভুট্টা-পাট-রোপা আমন ফসল বিন্যাস

বৃহত্তর টাংগাইল অঞ্চলের প্রচলিত ফসল ধারা আলু + শসা-রোপা আমন এর পরিবর্তে আলু + ভুট্টা-পাট-রোপা আমন ধানের উন্নত ফসল বিন্যাসের সুপারিশ করা হয়। প্রচলিত ফসল বিন্যাসের চেয়ে উদ্ভাবিত ফসল বিন্যাসের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে আলুর সমতুল্য ফলন হেক্টরপ্রতি ১৮.৬ টন পাওয়া গেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
ফসল	আলু	ভুট্টা	পাট	রোপা আমন
জাত	বারি আলু-৭	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭	ও-৯৮৯৭	ব্রি ধান-৪৯
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বর শেষ সপ্তাহ	ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহ	মে শেষ সপ্তাহ	আগস্ট শেষ সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১৫০০	২৫	৮	৫০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সে.মি.)	৬০ × ২৫	৬০ × ৩০	ছিটিয়ে	২০ × ১৫

(চলমান)

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
	সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	২৩৯	১২০	১৭১	১৯৭
টিএসপি	১৩০	-	১৭০	১০৫
এমওপি	২৫০	৬০	১২৪	৭৪
জিপসাম	১৩১	-	১২৫	৭৫
জিংক সালফেট	১০.৩	-	-	-
বরিক এসিড	১০.৬	-	-	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি				
	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া এবং বাকি সকল সার আলু তোলার পর অর্থাৎ ভুট্টা ৬ পাতা গজানোর পর প্রয়োগ করে গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া সমান দুই ভাগে চারা গজানোর ৩০ ও ৬০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া বপনের ২০-২৫ এবং ৪০-৪৫ দিন পর সমান দুই ভাগে ভাগ করে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া চারা লাগানোর ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহ	ফেব্রুয়ারি শেষ সপ্তাহ	মে ১ম সপ্তাহ	আগস্ট ১ম সপ্তাহ	নভেম্বর ৩য় সপ্তাহ
মাঠে বিদ্যমান ফসলের সময় কাল (দিন)	৯৫	৯৫	৯১	১০৩
ফলন (টন/হেক্টর)	২৬	৭.০	২.৭	৪.৩

আলু/ভুট্টা (সাথী ফসল)-রোপা আমন ফসল বিন্যাস

বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চল এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৪ এর অনুরূপ অন্যান্য অঞ্চলের জন্য আলু-পতিত-রোপা আমনের পরিবর্তে আলুর সাথে ভুট্টার সাথী ফসল হিসেবে রোপা আমন ফসল ধারা সুপারিশ করা হয়। উন্নত এই ফসল ধারায় পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বাড়ে ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত ফসল বিন্যাসের চেয়ে উদ্ভাবিত ফসল বিন্যাসে ধানের সমতুল্য ফলন গড়ে শতকরা ১১২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
ফসল	আলু	ভুট্টা	রোপা আমন
জাত	বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)	এনকে-৪০	ব্রি ধান-৪৯
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বর শেষ সপ্তাহ	ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহ	আগষ্ট শেষ সপ্তাহ
বপণ/রোপণ দূরত্ব (সে.মি.)	৬০ × ২৫	৭৫ × ২৫	২৫ × ১৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর):			
ইউরিয়া	২৫০	৫৫০	১৭৫
টিএসপি	১৫০	২৬০	৪০
এমওপি	২৫০	২২০	৬০
জিপসাম	১৪০	২৯৫	৫৬
জিংক সালফেট	১০	১৫	০
বরিক এসিড	১০	৭	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি			
	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া লাগানোর ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সব সার আলু উত্তোলনের পর ভুট্টার গাছে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া ভুট্টা ১০ পাতা অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া চারা লাগানোর ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
মাঠে বিদ্যমান ফসলের সময় কাল (দিন)	৯৫	১৫৪	১০০
ফলন (টন/হেক্টর)	২৪.২	৯.৬	৫.২

সাথী ফসল হিসেবে রোপা আমন ধানের সাথে মসুর ও সরিষার মিশ্র চাষ

পাবনা জেলার মধ্যম নিচু এলাকা এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১ এর অনুরূপ অঞ্চলের জন্য এ প্রযুক্তি উপযোগী। আমন ধান কাটার ১০-১৫ দিন পূর্বে জমিতে বিদ্যমান মাটির আর্দ্রতা ব্যবহার করে ১০০% মসুরের (বীজ হার: ৫০ কেজি/হেক্টর) সাথে ১০% সরিষা (০.৭ কেজি/হেক্টর) এর মিশ্র ফসল চাষ করে ১৪% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ প্রযুক্তিতে একক ফসল চাষের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং জমি চাষের খরচ কমে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	:	ফসলের বিবরণ		
ফসল	:	মসুর + সরিষা		
জাত	:	বারি মসুর-৭ + বারি সরিষা-১৪		
বপন দূরত্ব (সে.মি.)	:	ছিটিয়ে বোনা		
বপনের সময়	:	নভেম্বরের শুরুতে রোপা আমন ধান কাটার ১০ -১৫ দিন পূর্বে ১০০% মসুরের সাথে ১০% সরিষার বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে।		
ফসলের উত্তোলনের সময়	:	সরিষা: ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ মসুর : মার্চের প্রথম সপ্তাহ		
সারের মাত্র (কেজি/হেক্টর)	:	ইউরিয়া	৪০	
		টিএসপি	১৫০	
		এমওপি	৫০	
		জিপসাম	১১৩	
সারের প্রয়োগ পদ্ধতি	:	ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার বীজ বপনের সময় এবং ইউরিয়া সার বীজ বপনের ১১-১৫ দিন পরে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।		
ফলন (কেজি/হেক্টর)	:	মসুর: ১৭৮০	সরিষা: ৩৩০	মসুরের সমতুল্য ফলন: ১৯৭০

আলু-পাট-রোপা আমন ফসল বিন্যাসে আলুর সার সুপারিশমালা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১২ এ আলু-পাট-রোপা আমন ফসল ধারার আলুর জন্য সার সুপারিশমালা উদ্ভাবন করে। সুপারিশকৃত সার ব্যবহার করে উৎপাদন খরচ শতকরা ২৯ ভাগ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ
ফসল	আলু
জাত	বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)
রোপণ দূরত্ব (সে.মি.)	৬০ ×২৫
রোপণের সময়	নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ
বীজের হার (কেজি/হেক্টর)	১৫০০
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর):	
ইউরিয়া	৩৫০
টিএসপি	২২৫
এমওপি	২৬০
জিপসাম	১২৫
জিংক সালফেট	১৪
বরিক এসিড	১২
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্য সব সার বীজ রোপণের জন্য তৈরি নালাতে প্রয়োগ করতে হবে যাতে বীজের গায়ে না লাগে। বাকি ইউরিয়া লাগানোর ৩০ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয়বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহ	মার্চের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	২২.০

বিনা চাষে খড়ের মালচ্ ব্যবহার করে রসুন উৎপাদন

পাবনা জেলার নিচু ও মধ্যম নিচু অঞ্চলে বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর কাদা জমিতে মালচ্ ব্যবহার করে আর্দ্রতা সংরক্ষণের মাধ্যমে বিনা চাষে রসুন উৎপাদন করা যায়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কর্তৃক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় প্রতি হেক্টরে ৩ টন মালচ্ ব্যবহার করলে দীর্ঘ সময় ধরে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা যায় এবং উৎপাদন খরচও কমে আসে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে রসুনের ফলনও বৃদ্ধি পায় এবং ইউরিয়া উপরি প্রয়োগে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ
ফসল	রসুন
জাত	বারি রসুন-২
রোপণ দূরত্ব (সে.মি.)	১০ × ১০
রোপণ সময়	রসুনের কোয়া নভেম্বরের প্রথম দিকে রোপণ করতে হবে
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর):	
ইউরিয়া	২১৭
টিএসপি	২৭০
এমওপি	৩৩৫
জিপসাম	১২৫
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অন্য সব সার রোপণের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ২ ভাগ ইউরিয়া এক মাস পর পর দুই বার উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।
মাল্চ প্রয়োগ	আমন ধানের শুষ্ক খড় (৩ টন/হেক্টর) রসুনের কোয়া রোপণের পর সমভাবে বিছিয়ে দিতে হবে।
সংগ্রহের সময়কাল	মার্চের শেষ সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	১৪.০

লাউ এর সাথে ধনিয়ার আন্তঃফসল চাষ

ময়মনসিংহ জেলায় যেখানে একক ফসল হিসেবে লাউ চাষ করা হয় সেখানে লাউ মাচার নিচে ধনিয়ার বীজ ছিটিয়ে দিলে কোন পরিচর্যা ছাড়াই প্রচুর ধনিয়ার পাতা উৎপাদিত হয়। এতে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয়। এ প্রযুক্তিতে লাউ এর সমতুল্য ফলন ৬৭ টন প্রতি হেক্টরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ	
ফসল	লাউ	ধনিয়া (পাতা)
জাত	বারি লাউ-৩	বারি ধনিয়া-১
রোপণ দূরত্ব (মিটার)	২ × ২	ছিটিয়ে
রোপণের সময়কাল	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ	
সারের মাত্র (কেজি/হেক্টর):		
ইউরিয়া	১৭৫	
টিএসপি	১৭৫	
এমওপি	১৫০	
জিপসাম	১১৫	
জিংক সালফেট	১১	
বরিক এসিড	১২	
গোবর	১০ টন	
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সার, বোরন এবং ১/৩ ভাগ পটাশ সার মাদা তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া এবং অবশিষ্ট পটাশ সার সমান চার কিস্তিতে চারা রোপণের ১৫, ৩৫, ৫৫ ও ৭৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	
সংগ্রহের সময়কাল	জানুয়ারির ১ম সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ	বীজ বপনের ৩৫-৩৮ দিন পর সংগ্রহ করতে হবে।
ফলন (টন/হেক্টর)	৪৫.০	৩.১০

আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়ার চাষ

সিলেট এবং পটুয়াখালীর উপকূলবর্তী এলাকা এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১৮ এবং ২০ এর অনুরূপ এলাকায় শীতের সময় আমন ধান কাটার পর জমি পতিত অবস্থায় থাকে এবং মাটির আর্দ্রতা দ্রুত কমে যেতে থাকে। মাটির এই স্বল্প আর্দ্রতায় যেখানে অন্য কোন ফসল চাষ প্রায় অসম্ভব সেখানে আমন ধান কাটার ১৫-২০ দিন পূর্বে ধানের জমিতে সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়া সফলভাবে চাষ করা যেতে পারে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ	
ফসল	রোপা আমন ধান	মিষ্টি কুমড়া
জাত	ব্রি ধান-৩৩	বারি মিষ্টি কুমড়া-১
বপন/রোপণের সময়কাল	আগস্ট মাসের ২য় সপ্তাহ	রোপা আমন কাটার ১৫-২০ দিন পূর্বে
রোপণ দূরত্ব	২৫ সে.মি.× ১৫ সে.মি.	২-৩ মি. × ২-৩ মি.
সারের মাত্র (কেজি/হেক্টর):		
ইউরিয়া	১৫২	১৭৫
টিএসপি	৫৫	১৭৫
এমওপি	৮০	১৫০
জিপসাম	৬৩	১১৫
জিংক সালফেট	৩	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সব সার জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি ইউরিয়া বপণের ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	
সংগ্রহের সময়কাল	ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারি ২য় সপ্তাহ থেকে এপ্রিল শেষ সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	৩.৮০	২৫

“কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার”

সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তিসমূহের তথ্য সমৃদ্ধ “কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার” নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করেছে। মূলত এটি কৃষি প্রযুক্তি ভিত্তিক একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন। এই অ্যাপসটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা তাদের মোবাইল হ্যান্ডসেট এ ব্রাউজ করে তথ্য নিতে পারবেন। এই অ্যাপসটির মাধ্যমে উদ্ভাবিত ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি, বিশেষ করে রোগবালাই, পোকামাকড় ও সার ব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। অধিকতর তথ্যের জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন জানাতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর এসএমএস ও ই-মেইল এ পাওয়া যাবে। এছাড়াও অ্যাপসের উত্তর/মতামত অপশনেও উত্তর পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে সরাসরি কলের মাধ্যমে পরামর্শ নেয়া যাবে। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে স্বল্প মূল্যে কলের (১৬১২৩) মাধ্যমেও পরামর্শ নেয়া যাবে। ফলে উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তিসমূহের তথ্য বিনামূল্যে, স্বল্প সময়ে ও সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে।

এই অ্যাপসটি BARI Application “কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার” নামে Google Play Store হতে Android base mobile এ ডাউনলোড করে অফ লাইনে ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়াও এই অ্যাপসটি Android স্মার্টফোনের SHAREit এর মাধ্যমে অন্যান্য মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াও বিতরণ করা যাবে।

এছাড়াও Online এ যে কোন স্মার্টফোন (android/ windows/ iOS) এর ব্রাউজারে baritechnology.org/m ঠিকানা থেকে এই অ্যাপস এর ওয়েব ভার্সন (mobile web apps) টি ব্যবহার করা যাবে।